প্রথম অরুণা সংস্করণ
১৩৬৭

প্রকাশিকা
অরুণা বাগচী
অরুণা প্রকাশনী
৭ যুগলকিশোর দাস লেন
কলকাতা ৬

প্রচ্ছদপট
পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

মুদ্রক
পি. কে. পাল
শ্রীসারদা প্রেস
৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৯

উৎসর্গ

শ্রী প্রসেনজিৎ চৌধুরী

প্রীতিভাজনেষু

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত
জু ল ভে র্ন-এর
অন্যান্য বই

স্টীম হাউস
গডফ্রে মরগান
মিস্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড
বৈজ্ঞানিক নিরুদ্দেশ
এরাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ
ফাইভ উইকস ইন এ বেলুন
দুর্বার গতি বিভীষিকা
ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন
জার্নি টু দি সেণ্টার অভ দি আর্থ
রক্তমাখা পথে
প্যারচেজ অভ দি নর্থ পোল
যত ঝক্কি তত ঝামেলা
অ্যাড্রিফ্‌ট ইন দি প্যাসিফিক
লিভোনিয়া রহস্য
দি লাইট হাউস অ্যাট দি এণ্ড অভ দি ওয়ার্ল্ড
জুল ভের্ন-এর শ্রেষ্ঠ গল্প

নটিলাসের এই গল্প, এই Vingt Mille Lieues sous les Mers (১৮৭০), সম্ভবত জুল ভের্ন-এর সায়ান্স ফিকশনগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এর উপাদানগুলো উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেরই উপাদান: রহস্যময় নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্ব—সৃষ্টিশীল ও উদ্ভাবক, অথচ বিক্ষুব্ধ, অস্থির ও বিদ্রোহী; তবুও তার প্রতি শুধু আমাদের আবেগ নয়, বুদ্ধির এবং চেতনারও আকর্ষণ অপরিসীম: কাপ্তেন নেমো আর অধ্যাপক আরোনার সম্পর্ক ও পারস্পরিক প্রীতিকে হয়তো এই ভাবেই বর্ণনা করতে অনেকে লুব্ধ হবেন। নেপোলিয়ানকে ভুলে-যাওয়া ইওরোপের পক্ষে সম্ভবত কোনোদিনই সম্ভব হবে না: শাতোব্রিয়াঁর নায়ক, বায়রনের নায়ক, পুশকিনের নায়ক—আর হয়তো, এমনকি, গ্যেটেরও। হয়তো নেমোর এই গল্প ফাউস্ট পুরাণেরই অন্যতম ভাষ্য,—আসল জায়গাটিতে আঙুল রেখে কেউ-কেউ বলবেন। কিন্তু নেমো-আরোনার পারস্পরিক টান ছাড়াও আরো আছে নেড ল্যাণ্ড—যারা জগৎটাকে দখল ক'রে নেবে। এই ভবিষ্যৎবাণী হয়তো ডুবোজাহাজের কাহিনীর চেয়েও আরো জরুরি ছিলো মানুষের কাছে—আর জুল ভের্ন-এর দার্শনিক মনটি যে প্রখর ইতিহাসচেতনারই ওপর দাঁড় করানো, এটাও প্রমাণ করবার জন্য হয়তো জরুরি ছিলো অবশ্যম্ভাবী ছিলো ক্যানাডার তিমি শিকারী দুর্দান্ত হারাপুনবাজ নেড ল্যাণ্ড।

আরো একটা জরুরি প্রশ্ন তুলে ছিলেন জুল ভের্ন, ইওরোপ হয়তো এখনও যার উত্তর হাৎড়াচ্ছে: উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য বনাম পন্থা আর পদ্ধতি। নেমো উপনিবেশের উৎপীড়িত ও উৎখাত লোকদের সাহায্য করেন—অর্থ, নানা অস্ত্র-শস্ত্র ও প্রয়োজনীয় বহুবিধ সরঞ্জাম দিয়ে; তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক জাতিদের জাহাজ ডুবিয়ে দেন রোষে ও ঘৃণায় তুমুল ধ্বংসে। পরের বই, মিস্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড (L'Ile Mystérieuse : ১৮৭৫), যেখানে আমরা নেমোকে আবার দেখতে পাবো, সেখানে এই প্রশ্নের উত্তরও দেবেন জুল ভের্ন। নেমোর অতীত জীবনের উপর থেকে ঢাকা খুলে দেবেন, চমকে দেবেন আমাদের, তাক লাগিয়ে দেবেন, আর নিশ্চয়ই বলবেন লক্ষ্যটাই আসল, উদ্দেশ্যটাই সর্বস্ব। সেই জন্যেই সচলের মধ্যে চলন্তের এই গল্প এখন চিরায়ত সাহিত্যেরই একটি

ব'লে গণ্য হয়। গল্পের বুনুনি আর মুনশিয়ানাও চমৎকার ; সারাক্ষণ কৌতূহলী ক'রে রাখেন আমাদের, রাশ আলগা করেন না কখনও, রহস্য থাকে টান-টান ও রোমাঞ্চকর, আর ঘটনার পর ঘটনা যেন ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের মতো আমাদের কল্পনাকে কাঁপিয়ে দিয়ে চ'লে যায়। এই গল্পই প্রমাণ ক'রে দেয় যে বিজ্ঞান-ভিত্তিক কাল্পনিক কাহিনী গাঁজাখুরি বা আজগুবি কোনো ব্যাপার নয়। আর হয়তো এই জন্যেই এই বই জুল ভের্ন-এর বইগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

মাঘ ১৩৮০

কলকাতা

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১

তিমিঙ্গিল, না ডুবোপাহাড়?

১৮৬৬ সালে হঠাৎ য়ুরোপ আর আমেরিকার নাবিকদের মধ্যে হুলস্থুল বেঁধে গেলো। অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটছে সমুদ্রে—রহস্যময় ও বিপজ্জনক; প্রায়ই নাকি 'মস্ত কী-একটা' জন্তু দেখা যাচ্ছে জলের মধ্যে। লম্বা ছুঁচলো ঝকমকে একটা বিকট ব্যাপার—কেবল যে আকারেই তিমিমাছের চেয়ে ঢের বড়ো তা-ই নয়, গতিবেগেও তিমির চেয়ে অনেক ক্ষিপ্র। অতিকায় কোনো সিন্ধুদানব, বিজ্ঞান যার কোনো হদিশ রাখে না? কোনো মস্ত শৈলশ্রেণী, ভূগোলবিদ্যায় যার উল্লেখ নেই? এ-সব প্রশ্নের উত্তর কেউ জানে না ব'লেই নাবিকদের মধ্যে আতঙ্ক ও জনরব শুরু হ'লো প্রবলভাবে; খবরের কাগজগুলোও ফলাও ক'রে নানা সত্যিমিথ্যে প্রবন্ধ ছাপতে শুরু করলে; আর শেষটায় এমন কতগুলো ভয়ংকর ব্যাপার ঘ'টে গেলো যার ফলে নানা দেশের সরকার সুদ্ধু এই 'মস্ত কী-একটা'কে নিয়ে বিষম বিচলিত হ'য়ে পড়লেন।

এই অতিকায় বস্তুটিকে প্রথম দেখেছিলো 'গবর্নর হিগিনসন' জাহাজটি। 'গবর্নর হিগিনসন' ক্যালকাটা অ্যাণ্ড বার্নাক স্টীম নেভিগেশন কোম্পানির জাহাজ; ১৮৬৬ সালের ২০শে জুলাই জাহাজটি ছিলো অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব-উপকূলে, ডাঙা থেকে পাঁচ মাইল দূরে; হঠাৎ দেখা গেলো জলের উপর অতিকায় চুরুটের মতো লম্বাটে গড়নের আশ্চর্য একটা জিনিশ ভাসছে। ক্যাপ্টেন বেকার গোড়ায় ভেবেছিলেন বুঝি কোনো ডুবোপাহাড়ই আবিষ্কার ক'রে ফেলেছেন তিনি; কাঁটা-কম্পাস দিয়ে সবে তিনি মানচিত্রে তার অবস্থান নির্ণয় করতে যাচ্ছেন, অমনি হঠাৎ, বলা নেই কওয়া নেই, হুড়মুড় ক'রে ওই ডুবোপাহাড় থেকে ভীষণ দুটি জলস্তম্ভ উঠলো প্রচণ্ডবেগে—প্রায় দেড়শো ফুট অবধি।

সেই জলস্তম্ভ থেকে আবার—কিমাশ্চর্য!—ধোঁয়া আর বাষ্পও উঠছে! উষ্ণ প্রস্রবণ আছে তাহ'লে ওই ডুবোপাহাড়ে? না কি আদৌ কোনো ডুবোপাহাড়ই নয়, বরং মস্ত কোনো তিমিঙ্গিল? কিন্তু তিমিঙ্গিল থেকে বাষ্পময় জলস্তম্ভ ওঠে, এ-কথা তো কদাপি শোনা যায় নি। ক্যাপ্টেন বেকার কিঞ্চিৎ হতভম্ব হ'য়ে পড়লেন।

তিন দিন পরে—২৩শে জুলাই—ওয়েস্ট-ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড প্যাসিফিক স্টীম নেভিগেশন কোম্পানির জাহাজ 'কলম্বাস' ঠিক এই অদ্ভুত তিমিঙ্গিলটিকেই দেখলো প্রশান্ত মহাসাগরে—অর্থাৎ প্রায় ২১০০ মাইল দূরে। আরেকটা অতিকায় সিন্ধুদানব? না কি সেটাই তিন দিনের মধ্যে এত দূরে চ'লে এসেছে? তা যদি হয়, তাহ'লে এই ভাসমান গিরিশৃঙ্গটির গতিবেগ অবিশ্বাস্য বলতে হয়! তা যে রয়েছে, তা বোঝা গেলো যখন পনেরো দিন পরে তাকে দেখা গেলো ৬০০০ মাইল দূরে অতলান্তিক মহাসাগরে। ফরাশি জাহাজ 'হেলভেটিয়া' আর ব্রিটিশ জাহাজ 'শ্যানন' ঠিক তার মুখোমুখি পড়লো। এই জাহাজ দুটি আবার মাপটাপ নিয়ে দেখলো যে এই অতিকায় সিন্ধুদানব কিছুতেই সাড়েতিনশো ফুটের কম হবে না। কিন্তু এযাবৎ কেউ ষাট ফুটের চেয়ে বড়ো তিমি দেখেছে ব'লে শোনা যায় নি। ফলে পর-পর এই 'মস্ত কী-একটা'র খবর পেয়ে য়ুরোপ-আমেরিকার নৌ-জগতে সাড়া প'ড়ে গেলো। এ আবার নতুন কোন 'মবি ডিক'—হুজুগ পেয়ে ফলাও ক'রে প্রশ্ন তুললো কাগজগুলো।

সমস্ত জল্পনারই উত্তর এলো ১৮৬৭ সালের ১৩ই এপ্রিল যখন 'স্কটিয়া' নামে মস্ত একটি জাহাজ এই সিন্ধুদানবের প্রথম বলি হ'লো। অতলান্তিক মহাসাগরে কেপ-ক্লিয়ারের তিনশো মাইল দূরে তরতর ক'রে দিব্যি ছুটে চলছিলো 'স্কটিয়া'। আচমকা কিসের সঙ্গে যেন ছোট্ট-একটু ধাক্কা লাগে তার—এত আস্তে ধাক্কাটা লাগে যে গোড়ায় কেউ-কিছু টেরও পায় নি। কিন্তু নাবিকদের একজন হঠাৎ দেখতে পেলো যে ছ-ফুট চওড়া একটা মস্ত ফুটো দিয়ে হু-হু ক'রে জল ঢুকছে জাহাজের খোলে। সেই অবস্থাতেই ডুবু-ডুবু সেই জাহাজটিকে তক্ষুনি কোনোরকমে লিভার-

পুন বন্দরে নিয়ে আসা হ'লো। তারপর মেরামত করার জন্ত জাহাজটিকে ড্রাই-ডকে তুলেই তো সবাই স্তম্ভিত। লোহার পুরু চাদরে পরিষ্কার একটা তেকোনা গর্ত : যেন কোনো চোখা তুরপুন চালিয়ে জাহাজটিকে কেউ জখম ক'রে দিয়েছে!

ব্যাস, আর দেখতে হ'লো না! হুলুস্থুল বেঁধে গেলো সর্বত্র। পৃথিবীর প্রত্যেকটা খবরের কাগজে এই রহস্যময় দানবের গল্প ছাপা হ'তে লাগলো। নানা রকম থিয়োরি আর আজগবি তথ্যে বন্দরগুলি আতঙ্কে ও উত্তেজনায় থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো। কেউ বললে জানোয়ারটা আসলে একটা অতিকায় সামুদ্রিক সরীসৃপ—পুরাণ আর কিংবদন্তী থেকে তারা নিজেদের মতের সপক্ষে নানা নজির দিলে। কেউ আবার বললে ওটা মোটেই কোনো ডুবোপাহাড় বা গিরিশৃঙ্গ নয়, বরং মবি ডিকের মতোই কোনো দানোয়-পাওয়া মস্ত তিমি ; আর তা না-হ'লে—আরেক দল বললে—নিশ্চয়ই কোনো শক্তিশালী ডুবোজাহাজ। 'ডুবোজাহাজ যদি হয়,' কাগজগুলো রব তুললো, 'তাহ'লে বিষম ভয়ের কথা। কেননা চুপিসাড়ে লোকচক্ষুর আড়ালে এ-রকম একটা বিপুল যন্ত্র তৈরি করতে গেলে যে-পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা কেবল কোনো দেশের গবর্মেন্টেরই থাকতে পারে। আর, কোনো দেশের সরকারের হঠাৎ গোপনে ডুবোজাহাজ বানাবার প্রয়োজন হ'লো কেন? কী তার উদ্দেশ্য?'

তক্ষুনি খবর নেয়া হ'লো সর্বত্র। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, জর্মানি, ইস্পাহান, ইতালি, আমেরিকা, এমনকি তুরানদেশে পর্যন্ত খবর নেয়া হ'লো নানাভাবে। কিন্তু সব দেশেরই সরকার একবাক্যে অস্বীকার করলে—এ-রকম ডুবোজাহাজ যে সত্যি আছে, তা-ই নাকি তারা জানে না। আর এই সম্ভাবনাটাও যখন মিথ্যে ব'লে জানা গেলো, তখন গুজব ও জনরব আরো অস্থির-বিপুল আকার ধারণ করলে। নাবিকরা আবার এমনিতেই খুব কুসংস্কার মানে ; ফলে এমন-একটি দানবের মুখোমুখি পড়ার ভয়ে তারা যেন প্রায় শিটিয়ে গেলো।

এই অদ্ভুত জুজুর আতঙ্কে নাবিকরা যখন ভয়ে কাঁপছে, আমি তখন নিউ-ইয়র্কে প্রাকৃতিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছি।

২

আমি, পিয়ের আরোনা

আমার নাম পিয়ের আরোনা। পারী মিউজিয়ামের প্রাকৃতিক ইতিহাসের অধ্যাপক আমি। সেই সূত্রেই আমাকে কিছুকাল আগে নেব্রাস্কা যেতে হয়েছিলো দুষ্প্রাপ্য কিছু উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণীসংগ্রহের অভিযানে। ফ্রান্সে ফেরার পথে নিউ-ইয়র্কে এসে আমি যখন সংগৃহীত জিনিশগুলির একটা তালিকা তৈরি করছি, তখনই এই অতিকায় সিন্ধুদানবের জনরব বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়লো।

সত্যি এটা কোনো সামুদ্রিক প্রাণী কিনা, প্রাকৃতিক ইতিহাসের অধ্যাপক ব'লে এ-সম্বন্ধে মতামত চাওয়া হ'লো আমার কাছে। 'নিউ-ইয়র্ক হেরাল্ড' কাগজের প্রতিনিধির অনুরোধে ৩০শে এপ্রিল আমি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলুম। সমুদ্রতল যে এখনো কৌতূহলী ও উন্মুখ মানুষের কাছে বিষম রহস্যের আধার, এটাই ছিলো আমার প্রবন্ধের মূল বক্তব্য। পৃথিবীর মাত্র একভাগ স্থল, বাকি তিনভাগই জল—আর সেই জলের তলায় কী আছে, তার কতটুকুই বা আমরা জানি। আমরা কেবল কতগুলো অনুমান ও ধারণা করতে পারি মাত্র। যদি সমুদ্রতলের সমস্ত জীবদের কথাই আমরা এতদিনে জানতে পেরে থাকি, এবং যদি বিভিন্ন দেশের সরকার সত্যিই কোনো প্রবল ও গোপন ডুবোজাহাজের অস্তিত্ব অস্বীকার ক'রে থাকেন, তাহ'লে, বলা বাহুল্য—আমি প্রবন্ধে বললুম—জিনিশটি আসলে একটি অতিকায় নারহোয়াল—অর্থাৎ বিকট খড়্গের মতো দন্তময় সেই মহাকায় সামুদ্রিক ড্রাগন, মেরুবলয়ের হিমজল যার গোপন আবাস। অবশ্য নারহোয়াল যে ষাট ফুটের বেশি

লম্বা হয়, তা এতকাল আমরা জানতুম না—অথচ নানা তথ্য থেকে জানা গেছে যে এই হিংস্র ও খুনে নারহোয়ালটি প্রায় সাড়ে-তিনশো ফুট লম্বা। এমন হ'তে পারে যে আদিকালের একটি নারহোয়াল প্রকৃতির কোনো অদ্ভুত খেয়ালে এই উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক কালেও কোনোক্রমে বেঁচে ছিলো—সে-ই হঠাৎ সমুদ্রতল আলোড়িত ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে নারহোয়াল বা সী-ইউনিকর্ন ব'লে মনে করার কারণ 'স্কটিয়া' জাহাজের লোহার পুরু চাদরের খোলের মধ্যে ওই বিপুল ও আকস্মিক ছ্যাদাটি—কারণ কেবলমাত্র নারহোয়ালেরই মাথায় ইস্পাতের মতো কঠিন ও সুদৃঢ় খড়্গ থাকে, যার এক ধাক্কায় এমনকি লোহার পুরু-চাদর সুদ্ধু ফুটো হ'য়ে যেতে পারে। অবশ্য আমার এই আন্দাজ যে পুরোপুরি সত্যি, তা বলি না। কারণ এই অতিকায় জীবটি সম্বন্ধে হয়তো সমস্ত তথ্য এখনও আমরা জানি না।

আমার প্রবন্ধের সারমর্ম মোটামুটি এই। কিন্তু এই প্রবন্ধ বেরোবার সঙ্গে-সঙ্গেই চারদিকে নানারকম জল্পনা শুরু হ'য়ে গেলো। এদিকে আবার আরো জাহাজডুবির খবর আসতে লাগলে: সবাই যে এই নারহোয়ালের খড়্গের আঘাতের ফল, তা নয়। তবু চারদিকে একটা বিষম আতঙ্কের রেশ প'ড়ে গেলো। সবাই ভাবলে যে এই অতিকায় খুনে জীবটিই বুঝি সব সর্বনাশের মূল।

অবস্থা যখন এই রকম, তখন মার্কিন নৌ-বহর স্থির করলে যে এই সামুদ্রিক আতঙ্ক দূর করার জন্য তারা একটি যুদ্ধজাহাজ পাঠাবে: সমুদ্রের এই বিভীষিকার সঙ্গে সরাসরি লড়াই করবে এই জাহাজ; মস্ত কামানওলা এই জাহাজটির নাম 'আব্রাহাম লিঙ্কন'। অভিযানের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুটের ওপর; তাঁর অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তা এই বিভীষিকাটি নিপাত করার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

ব্রুকলিন জাহাজঘাটা থেকে 'আব্রাহাম লিঙ্কন' ছেড়ে যাওয়ার ঠিক তিন ঘণ্টা আগে আমার কাছে নিচের চিঠিটা এসে পৌঁছোলো:

'মহাশয়, অনুগ্রহপূর্বক আপনি 'আব্রাহাম লিঙ্কনে'র সামুদ্রিক অভিযানে যোগদান করিলে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার আপনার মাধ্যমে ফরাসি দেশকে ইহাতে লাভ করিতে পারিয়া অনুগৃহীত ও আনন্দিত হইবে। ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট আপনার জন্য একটি কেবিন নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।

বশংবদ

মার্কিন নৌ-বহরের সম্পাদক

জে. বি. হবসন।'

এই চিঠি পাবার আগে, চাঁদে পাড়ি দেবার মতো, এই সামুদ্রিক অভিযানে বেরোবার সম্ভাবনাটা স্বপ্নেও আমার মনে জাগে নি। কিন্তু হঠাৎ এই চিঠিটা পাবার পরই মনে হ'লো পৃথিবীর সব সম্পদের বিনিময়েও এই সোনালি সুযোগ আমি হাতছাড়া করতে পারবো না।

তক্ষুনি অধীরভাবে আমার পরিচারক কোনসাইলকে ডাক দিলুম। কোনসাইল আসলে ওলন্দাজ, সাহসী বিশ্বস্ত ও অনুগত। আমার সমস্ত অভিযানেই সে সঙ্গী হয়, কোনো প্রশ্ন তোলে না, নীরব কর্মীর মতো সমস্ত ক'রে ফ্যালে মুহূর্তে, কোনো কিছুতেই তার বিস্ময় নেই। ফলে ক্ষিপ্রহাতে জিনিশপত্র গোছাতে-গোছাতে কোনসাইল যখন শুনলো যে আমরা এবার এই সিন্ধুদানবের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরোচ্ছি, সে মোটেই অবাক হ'লো না; আমার কথার ফাঁকে-ফাঁকেই চটপট সে সব গুছিয়ে নিলে! আমার অভিযানের নিদর্শন ও সংগ্রহগুলো আমি পারী বিচিত্রাভবনে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে দিলুম। অতঃপর যখন কোচবাক্সে ব'সে আমরা নিউ-ইয়র্কের জাহাজঘাটায় পৌঁছোলুম, তখন দেখি 'আব্রাহাম লিঙ্কন' তার সামুদ্রিক অভিযানের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আছে—তার মস্ত দুটি চিমনি দিয়ে ভলকে-ভলকে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

তক্ষুনি আমাদের মালপত্র জাহাজে তুলে ফেলা হ'লো। আমরাও জাহাজে গিয়ে উঠলুম। একজন নাবিককে জিগেস করতেই সে আমাকে এক হাসি-খুশি অফিসারের কাছে নিয়ে এলো। তিনি আমাদের দেখেই

হাত বাড়িয়ে দিলেন। জিগেস করলেন, 'মঁসিয় পিয়ের আরোনা?'

'আমি স্বয়ং,' উত্তর দিলুম আমি, 'আপনি ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট তো?'

'সশরীরে বর্তমান। আপনার কামরা তৈরি আছে, প্রফেসর।'

তাঁকে ডেকের উপরে রেখেই কোনসাইলকে নিয়ে আমি আমার কেবিনে গিয়ে ঢুকলুম।

লং-আইল্যাণ্ডের হলদে বেলাভূমি ছেড়ে 'আব্রাহাম লিঙ্কন' যখন তার অভিযানে বেরোলো, তখন তিনটে বাজে। তীরে হাজার-হাজার নরনারী দাঁড়িয়ে রুমাল উড়িয়ে আমাদের বিদায় জানালে। এমনকি মস্ত একটা বড়োপাল্লার কামান থেকে তোপধ্বনিও করা হ'লো আমাদের বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে। রাত যখন আটটা, তখন ফায়ার-আইল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব দিয়ে অতলান্তিক মহাসাগরের ফেনিল, কালো ও রহস্যময় জলের মধ্যে গিয়ে পড়লো 'আব্রাহাম লিঙ্কন'।

তিমি শিকারের যাবতীয় শরঞ্জাম টাল ক'রে রাখা ছিলো জাহাজে। কেবল যে হাতে ছোঁড়ার শাদাশিধে হারপুনই ছিলো তা নয়, এমনকি অতি-আধুনিক হারপুন-বন্দুক সুদ্ধু বাদ যায় নি। আর ছিলো নেড ল্যাণ্ড—হারপুন ছোঁড়ার রাজা। বয়েস তার চল্লিশের মতো—আমারই প্রায় সমান— ; ঢ্যাঙা, অসুরের মতো চেহারা, ছ-ফুটের উপর লম্বা, গম্ভীর অথচ দিলদরিয়া, কিন্তু যখন-তখন ভয়ংকর হ'য়ে উঠতে পারে; ক্ষিপ্রতায়, দুঃসাহসে ও কৌশলে তার জুড়ি নেই ব'লেই কোনো অতি-চালাক তিমির পক্ষেও তার হারপুনকে এড়িয়ে-যাওয়া সম্ভব হয় না। তীক্ষ্ণ-প্রবল দৃষ্টিশক্তি তার মুখের মধ্যে দৃঢ়তার রেশ এনে দিয়েছে। এই অকুতোভয় মানুষটিকে নিয়োগ ক'রে ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে আমার কোনো সন্দেহ ছিলো না।

ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট অবশ্য আরেকটি কাজও করেছিলেন। ওই খুনে জানোয়ারটাকে যে সবচেয়ে আগে দেখতে পাবে, তাকে দু-হাজার ডলার পুরস্কার দেয়া হবে ব'লে ঘোষণা করেছিলেন তিনি। ফলে সকলেরই উৎসাহ খুব বেড়ে গিয়েছিলো। প্রত্যেকেই দিনরাত ডেকের

উপর দাঁড়িয়ে সমুদ্রের অথৈ-চঞ্চল জলরাশির দিকে তাকিয়ে থাকতো।

কিন্তু কোথায় কী? সেই অতিকায় সিন্ধুদানবের কোনো পাত্তাই পাওয়া গেলো না। শেষকালে কেপ হর্ন পেরিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে পড়লুম আমরা। কিন্তু তবু সেই সিন্ধুদানবের কোনো চিহ্নই নেই। তবে কি সমস্ত জনরব আসলে কোনো অমূল কল্পনা? কোনো অলীক স্বপ্নবিলাস? তা কেমন ক'রে হয়? কারণ 'স্কটিয়া'র সেই মস্ত ছিদ্রটি তো মিথ্যে নয়!

তাহ'লে?

৩

'ওই যে, ওখানে'

কোনসাইল-এর যে দু-হাজার ডলার পুরস্কারের প্রতি কোনো লোভ ছিলো না, তা নয়। কিন্তু আমার বেলায় ব্যাপারটা ছিলো সম্পূর্ণ অন্য রকম। পুরস্কারের তোয়াক্কা রাখি না আমি। কিন্তু তবু কিসের টানে যেন আমিও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডেকের উপর দাঁড়িয়ে থাকতুম। আমি নিজের চোখে এই সিন্ধুদানবকে দেখতে চাই। জানতে চাই সে আসলে কোনো অতিকায় নারহোয়াল বা কিংবদন্তীর সিন্ধুড্রাগন কি না। কিন্তু দিনের পর দিন একটানা তাকিয়ে থেকে কেবল চোখ দুটিই টনটন করতে লাগলো —হঠাৎ ঢেউয়ের মধ্যে ভেসে-ওঠা কালো তিমির বিশাল পিঠ ছাড়া আর-কিছুই চোখে পড়লো না, কোনো শাদা তিমি বা কোনো বিপুল মবি ডিক পর্যন্ত না।

সাতাশে জুলাই আমরা বিষুবরেখা ছাড়িয়ে এলুম। জাপানের দিকে এগিয়ে চললুম আমরা। কিন্তু নাবিকরা ততক্ষণে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছে। তারা কিছুতেই আর এই অর্থহীন কল্পনাবিলাসের পিছনে ঘুরে বেড়াতে চায় না। শেষকালে তাদের চাপে প'ড়ে ক্যাপ্টেন

ক্যারাগুটকেও ক্রিস্টোফার কলম্বাসের মতো বলতে হ'লো যে আর তিনদিনের মধ্যে যদি এই সিন্ধুদানবের সন্ধান না পাওয়া যায় তাহ'লে 'আব্রাহাম লিঙ্কন'কে তিনি আবার নিউ-ইয়র্কে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। কে কোথায় নেশার ঘোরে কোন আজব ও অতিকায় একটি জীব দেখেছে, সেই জন্যে সেই বন্য হংসের পিছনে হুড়মুড় ক'রে ছুটে বেড়ানোর কোনো মানে হয় না। খামকাই এত পথ এলো 'আব্রাহাম লিঙ্কন'—কোনো অলীক বুনো হাঁসের পিছন-পিছন।

দু-দিন কেটে গেলো। টোপ ফেলে সিন্ধুদানবটাকে কাছে আনার জন্য বড়ো-বড়ো মাংসের টুকরো ফেলা হ'তে লাগলো জলের মধ্যে, এবং তার ফলে হাঙরদের মধ্যে ভোজ শুরু হ'লো বটে, কিন্তু সেই সিন্ধু-দানবের রহস্য পূর্ববৎ সেই একই অনন্ত তিমিরে ঢাকা র'য়ে গেলো।

জাপান তখন আর মাত্র দু-শো মাইল দূরে। আরেকটা দিনও যদি এমনিভাবে কেটে যায়, তাহ'লে 'আব্রাহাম লিঙ্কন' আর মিথ্যে বুনো হাঁসের পিছনে না-ছুটে দেশে ফিরে যাবে। ঢং-ঢং ক'রে রাত্রি আটটা বাজলো। আমরা অনেকেই উদ্গ্রীবভাবে ডেকের উপর দাঁড়িয়ে আছি ; যদি শেষমুহূর্তে দানবটির দর্শন পাওয়া যায়, এই প্রত্যাশায়।

কোনসাইলের স্নায়ু ব'লে কোনোকিছু কোনোকালে ছিলো ব'লে আমি টের পাই নি। কিন্তু এখন তাকেও কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত দেখা গেলো। হেসে বললুম, 'কোনসাইল, ওই দু-হাজার ডলার পকেটস্থ করার এই শেষ সুযোগ তোমার। ছাখো, পারো কিনা।'

'মঁসিয় কি দয়া ক'রে আমাকে এ-কথা বলার সুযোগ দেবেন যে আমি কোনো দিনই পুরস্কারের প্রত্যাশা করি নি—যুক্তরাষ্ট্রের সরকার যদি লাখ ডলারও পুরস্কার ঘোষণা করতেন, তাহ'লেও তাঁদের কিছুতেই ওই টাকাটা হারাতে হ'তো না। কারণ ওই রকম কোনো সিন্ধুদানব কদাচ ছিলো কি না তাই আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

'তুমি ঠিকই বলেছো, কোনসাইল। আমরা যে কেবল ছ-মাস সময় খামকা নষ্ট করলুম, তা-ই নয়—ফিরে গিয়ে দেখবো লোকের কাছে রীতি-

মতো হাস্যাস্পদ হ'য়ে উঠেছি—'

ঠিক তক্ষুনি নেড ল্যাণ্ডের প্রবল চীৎকার শোনা গেল : 'ওই-যে ! আমরা যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, অবশেষে সেই-তিনি সশরীরে হাজির ! ওই-যে, ওখানে !'

৪

অতল জলের আহ্বান

নেডের চীৎকার শুনে জাহাজের সব লোক তার দিকে ছুটে গেলো। এবার কিন্তু সিন্ধুদানব আর-কারো অগোচর রইলো না। দেখতে পেলুম জাহাজ থেকে বেশ খানিকটা দূরে সমুদ্রের জল আলো হ'য়ে উঠেছে ; জলের উপর ভেসে উঠেছে সেই রহস্যময় দানবটির প্রকাণ্ড পিঠ, আর তার গা থেকেই এই উজ্জ্বল চোখ-ধাঁধানো আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। কিন্তু তখন আর ভালো ক'রে ধীরে-সুস্থে তাকে অবলোকন করার অবস্থা ছিলো না, কারণ সচমকে আমরা দারুণ আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ্য করলুম, দানবটা প্রচণ্ড বেগে আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে।

জাহাজের মধ্যে যে-সমস্বর শোরগোল উঠলো, তাতে আমার সভয় চীৎকার ঢাকা প'ড়ে গেলো। কিন্তু তারই ভিতর অবিচল রইলেন শুধু ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট। তাঁর নির্দেশমতো বোঁ-ক'রে অর্ধবৃত্তাকার পথে ঘুরে গিয়ে 'আব্রাহাম লিঙ্কন' ধাবমান দানবটির কাছ থেকে স'রে যেতে লাগলো। কিন্তু দ্বিগুণ বেগে আমাদের দিকে ধেয়ে আসতে লাগলো সমুদ্রের সেই প্রজ্বলন্ত বিভীষিকা। কিন্তু তারপরেই—আবার আশ্চর্য !—হঠাৎ এক জায়গায় সে থমকে দাঁড়িয়ে গেলো, তারপর আস্তে জাহাজটার চারপাশ একবার প্রদক্ষিণ ক'রে নিলো—যেন কোনো শিকারী জন্তু চড়াও হবার আগে তার শিকারের ক্ষমতা ও সাধ্য আন্দাজ ক'রে নিতে চাচ্ছে। কলের জাহাজ যেমন যাওয়ার সময় পেছনে লম্বা ও কুণ্ডলিত

ধোঁয়ার রেখা রেখে যায়, ঠিক তেমনি পুঞ্জীভূত আলোকিত কুয়াশার রেখা এঁকে গেলো জলের মধ্যে, তারপর অবিশ্রান্ত গতিতে তার পরিক্রমা সম্পূর্ণ ক'রে জানোয়ারটা আচম্বিতে জাহাজ লক্ষ্য ক'রে উল্কার মতো ধেয়ে এলো।

'শামাল! শামাল!' রব উঠলো জাহাজে। কিন্তু জাহাজের একেবারে মুখোমুখি এসেই আচমকা সেই তীব্র আলোর ছটা মিলিয়ে গেলো। পরক্ষণেই জাহাজের অন্যধারে দেখা গেলো সেই প্রজ্বলন্ত বিভীষিকা। রাতের অন্ধকারে আমরা ঠাহরই করতে পারলুম না জানোয়ারটা ডুব দিয়ে ওধারে গেলো, না জাহাজটিকে নিছকই প্রদক্ষিণ ক'রে গেলো।

'আব্রাহাম লিঙ্কন' তখন ঝপাঝপ আলো নিভিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। অবাক হ'য়ে ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুটকে জিগেস করলুম, 'ব্যাপার কী?'

'রাতের অন্ধকারে ওই অদ্ভুত জানোয়ারটার সঙ্গে লড়াই ক'রে তো আর আমার জাহাজ আর লোকজনের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারি না,' ক্যাপ্টেন বললেন, 'কাল দিনের বেলায় দেখবো সমুদ্রের ওই শত্রু কত শক্তি ধরে।'

সে-রাতে কারো চোখেই একফোঁটা ঘুম নামলো না। উত্তেজনায় ও আতঙ্কে সবাই কেমন টান-টান হ'য়ে আছে—তীর ছোঁড়ার আগে ধনুকের ছিলা যেমন টান হ'য়ে যায়। সবাই রুদ্ধশ্বাসে জানোয়ারটার গতিবিধি লক্ষ্য করার চেষ্টা করছে, কিন্তু মাঝরাত্রে হঠাৎ সেই সিন্ধুদানব যেন কোন অতলে মিলিয়ে গেলো। যেন দপ ক'রে কোনো অতিকায় জোনাকি নিভে গেলো অকস্মাৎ। কিন্তু শেষরাতের দিকে আবার সেই বিচিত্র আলো দেখা গেলো সামনে। সেই সঙ্গে শোনা গেলো জলে ল্যাজ আছড়ানোর আক্রোশ, ফোঁস-ফোঁস নিশ্বেস ছাড়ার ভয়ংকর ও অলুক্ষুণে আওয়াজ।

আক্রমণ শুরু হ'লো প্রাতঃকালে। সকাল হ'তে-না-হ'তেই হারপুন

ঝাঁপিয়ে নেড তার নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর পুরোদমে ইঞ্জিন চালিয়ে দেয়া হ'লো।

জ্বলন্ত লাল বলের মতো তখন সূর্য উঠছে দিগন্তে, আর জানোয়ারটার সেই উগ্র আলো যেন নিভে গেছে মন্ত্রবলে। মাইল দু-এক দূরে ঢেউয়ের উপরে তার অতিকায় কালো শরীর ভেসে আছে। তিমিমাছের মতো স্তম্ভের আকারে জলের ধারা সে ছুঁড়ে দিচ্ছে—প্রায় চল্লিশ ফুট উঠে গেছে সেই জলস্তম্ভ। আমাদের জাহাজ ক্যাপ্টেনের নির্দেশ অনুযায়ী পুরোদমে জন্তুটির দিকে ছুটে যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য, দিগন্ত যেমন ক'রে পিছিয়ে যায়, মরীচিকা যেমন ক'রে স'রে যেতে থাকে, তেমনিভাবে জন্তুটিও কেবল পিছিয়ে যাচ্ছে তখন—দূরত্বটা আর-কিছুতেই কমছে না।

ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট আরো জোরে জাহাজ চালাতে নির্দেশ দিলেন, ইঞ্জিনের প্রচণ্ড নির্ঘোষ উঠলো সবকিছুকে ছাপিয়ে; কোনো-এক অতিকায় হৃৎপিণ্ডের মতো আস্ত জাহাজটা যেন ধ্বক-ধ্বক ক'রে বেজে উঠছে, থরোথরো কেঁপে উঠছে আস্ত পাটাতনটি। কিন্তু দূরত্বটা সমান রেখে ঠিক ততখানি বেগেই জানোয়ারটাও দূরে চ'লে যাচ্ছে—যেন কোনো মজার খেলায় সে মেতে উঠেছে।

দূরত্ব যখন একটুও না-ক'মে একই থেকে গেলো আগের মতো, ক্যাপ্টেন তখন কামান দাগাব আদেশ দিলেন।

কামানের নির্ঘোষ মেলাবার আগেই দেখা গেলো জন্তুটির মসৃণ-কঠিন চামড়ার উপর গোলাটা পিছলে গিয়ে সমুদ্রের জলে ঠিকরে পড়লো।

এই পশ্চাদ্ধাবন চললো সারাদিন ধ'রে। শেষকালে বেলা প'ড়ে এলো ধীরে-ধীরে, ডুবে গেলো সূর্য, নেমে এলো অন্ধকার; আর সেই অন্ধকারে অদ্ভুত এই জন্তুটারও আর-কোনো হদিশ পাওয়া গেলো না। কিন্তু রাত যখন এগারোটা, হঠাৎ মাইল তিনেক দূরে গত রাত্রির মতোই সমুদ্রের বুকে আবার জ্ব'লে উঠলো সেই চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো—তাছাড়া আর-কোনো সাড়াশব্দ নেই তার। সারা দিনের পরিশ্রমে তাহ'লে কি অবসন্ন দানবটি ঘুমিয়ে পড়েছে?

অন্তত ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুটের তা-ই ধারণা হ'লো। সুবর্ণ সুযোগ মনে ক'রে সন্তর্পণে জাহাজটিকে তার দিকে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন তিনি। ইঞ্জিন বন্ধ ক'রে দিয়ে নিঃশব্দে 'আব্রাহাম লিঙ্কন' সেই প্রজ্বলন্ত কালো দানবটির দিকে এগিয়ে গেলো।

আর মাত্র বিশ ফুট দূরে প'ড়ে আছে দানবটা, নিঃসাড়, কালো ও উজ্জ্বল। নেড ল্যাণ্ড আর একটুও দেরি না-ক'রে প্রচণ্ড বেগে তার হারপুন ছুঁড়লো জন্তুটির দিকে। ঠক্! একটা চাপা শব্দ উঠলো—হারপুনটা দানবটার গায়ে আছড়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে।

অমনি, নিমেষের মধ্যে, সেই উজ্জ্বলপ্রবল আলো নিভে গেলো। প্রচণ্ড দুটি জলের ধারা এসে পড়লো জাহাজের উপর, যেন কোনো সিন্ধু-ঐরাবত তার শুঁড় দিয়ে জল ছুঁড়ে মারছে। প্রচণ্ড তোড়ে মুহূর্তে সব লণ্ডভণ্ড হ'য়ে গেলো। মাস্তুল ভেঙে পড়লো মুহূর্তে, ছিঁড়ে গেলো দড়ি-দড়া, নাবিকরা আছড়ে পড়লো এ ওর গায়ে। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি অনুভব করলুম আমি, তারপরেই রেলিঙের উপর দিয়ে সমুদ্রে ছিটকে পড়লুম।

এত জোরে ছিটকে পড়েছিলুম যে তলিয়ে গিয়েছিলুম প্রথমটায়! কিন্তু সাঁতার জানা ছিলো ব'লে ভেসে উঠতে পারলুম। সাঁতার দিতে-দিতে তাকিয়ে দেখি পুবদিকে ধীরে-ধীরে 'আব্রাহাম লিঙ্কন'-এর আবছা ছায়া মিলিয়ে যাচ্ছে।

খ্যাপার মতো চীৎকার করতে লাগলুম আমি—কিন্তু জাহাজের কেউ আমার সেই চীৎকার শুনতে পেলো ব'লে মনে হ'লো না। প্রাণ-পণে হাত-পা চালিয়ে সাঁতার কেটে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলুম কেবল; কিন্তু সেটাও মস্ত ভুল হ'লো—তার ফলে অল্পেতেই ভয়ানক ক্লান্ত লাগলো নিজেকে; নিশ্বেস বন্ধ হ'য়ে আসছে ক্রমশ; বুঝতে পারছি যে ডুবে যাচ্ছি, কিন্তু কিছুই করার নেই; ভিজে ভারি পোশাকে হাত-পা যেন লোহার মতো ভারি হ'য়ে উঠেছে।

কয়েক ঢোক নোনাজল খেয়ে যখন তলিয়ে গেছি, তখন শক্ত মুঠোয়

আমার জামার কলার চেপে ধ'রে যে আমাকে টেনে তুললো, সে আমার অনুগত ভৃত্য কোনসাইল।

'কোনসাইল! তুমি!' অনেক চেষ্টা ক'রে এই দুটি কৃতজ্ঞ ও বিস্মিত কথাই আমি উচ্চারণ করতে পারলুম।

'হ্যাঁ, মঁসিয়, আমি। আপনি জলে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমিও আপনার পিছনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম।'

'কিন্তু "আব্রাহাম লিঙ্কন"? আমাদের জাহাজ? সে যে চ'লে গেলো—'

'কিছুই করার নেই তাদের, মঁসিয়। জন্তুটার দারুণ কামড়ে জাহাজের হাল আর চাকা খণ্ড-খণ্ড হ'য়ে গেছে! কাজেই অথৈ জলে নিরুপায়ভাবে নিয়ন্ত্রণবিহীন ভেসে-যাওয়া ছাড়া তাদের আর-কিছুই করার নেই। জলে পড়ার আগেই নাবিকদের চ্যাঁচামেচিতে এই খবরটা জানতে পেরেছিলাম ব'লেই আমি আর খামকা ওদের ডাক দিই নি।'

'তাহ'লে উপায়?' বুদ্ধিভ্রংশের মতো অসহায়ভাবে কোনসাইলকে আমি জিগেস করলুম।

আমার কথার কোনো উত্তর না-দিয়ে, ছুরি বার ক'রে আমার পোশাক কেটে কোনসাইল আমাকে ভারমুক্ত ক'রে দিলে। তারপর নিজের পোশাকও অমনিভাবে ছুরি দিয়ে কেটে সে বিসর্জন দিলে। অতঃপর শুরু হ'লো পালা ক'রে একজনের সাঁতার কাটা আর অন্য জনের ভাসমান দেহকে ঠেলে-নিয়ে-যাওয়া। অকূল সমুদ্রের মধ্যে এ-ভাবে সাঁতার দিয়ে লাভই বা কী? কতক্ষণ আর এভাবে জলের উপর ভেসে থাকতে পারবো? কিন্তু একেবারে হাল না-ছেড়ে দিয়ে কিছু-একটা করা ঢের ভালো—এই কথা মনে রেখে আমরা পালাবদল ক'রে সাঁতার দিতে লাগলুম।

কিন্তু তাও আর কতক্ষণই বা সম্ভব? অল্পক্ষণের মধ্যেই এমনি অবসাদে ভ'রে গেলুম যে দেহের শেষ শক্তিবিন্দুটুকু পর্যন্ত হারিয়ে গেলো। হাত-পা সব অবশ, দৃষ্টি আচ্ছন্ন, মাথার ভিতর তাজ্জিম-মাজ্জিম করছে, বোধহয়

উদ্ধারের আর কোনো সম্ভাবনাই নেই—এমন সময়ে হঠাৎ একটা কঠিন জিনিশের গায়ে ধাক্কা খেলুম। আর অমনি কে যেন সবল হাতে আমাকে আঁকড়ে ধ'রে জলের উপর থেকে তুলে নিলে। তারপর আর-কিছু মনে নেই।

চেতনা ফিরে আসতেই দেখি দুটি উদ্বিগ্ন মুখ আমার উপর ঝুঁকে আছে—নেড ল্যাণ্ড আর কোনসাইল। তৎক্ষণাৎ ধড়মড় ক'রে উঠে বসবার চেষ্টা করলুম। 'নেড ল্যাণ্ড! তুমি?'

'হ্যাঁ, প্রফেসর আরোনা, আমি। পুরস্কারের টাকার মায়াটা কিছুতেই ছাড়তে পারলুম না, তাই এবার একেবারে জানোয়ারটার পিঠেই চেপে বসেছি। অত জোরে হারপুন ছোঁড়া সত্বেও নেড ল্যাণ্ডের হারপুন কেন ঠং ক'রে লেগে ঠিকরে গিয়েছিলো, তা এবার বুঝতে পারছি, প্রফেসর। কোনো হারপুন কি আর ইস্পাতের বর্ম ভেদ করতে পারে?'

'তার মানে?'

'তার মানে অত্যন্ত সরল, প্রফেসর। আপনি যার উপর ব'সে আছেন, সেটা যে আসলে অতিকঠিন একটি ধাতুনির্মিত খোল, তা আপনি হাত বুলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন। আর যার পিছনে আমরা সর্বকর্ম ছেড়ে তেড়ে গিয়েছিলাম, সেটা আসলে তিমি নয়, তিমিঙ্গিলও নয়, অথবা অতিকায় ও অজ্ঞাত কোনো সিন্ধুদানবও নয়, সেটা আসলে একটি—'

'ডুবোজাহাজ!' বিমূঢ় আমি কলের পুতুলের মতো তার মুখে কথা জুগিয়ে দিলুম।

'ঠিক তাই।'

ততক্ষণে আস্তে পুবদিকে লাল ছোপ দিচ্ছে; গোল একটা আগুনের চাকার মতো টকটকে সূর্য উঠে আসছে সমুদ্রের জল থেকে। হঠাৎ এমন সময়ে পায়ের তলার বিশাল ভাসমান বস্তুটা ন'ড়ে উঠলো। তারপরেই সেটা ডুবতে শুরু করলো আস্তে-আস্তে।

আমরা সবাই আতঙ্কে লাফিয়ে উঠলুম। খ্যাপার মতো ডুবো

জাহাজটার গায়ে পদাঘাত করতে-করতে নেড ল্যাণ্ড প্রচণ্ড ও নিরর্থক চীৎকার শুরু ক'রে দিলে।

হয়তো নেডের ওই চীৎকার একেবারেই নিরর্থক ছিলো না। কারণ আচমকা সেই বিচিত্র ডুবোজাহাজটি নিশ্চল হ'য়ে গেলো, তারপর ঢাকনি খুলে ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো একটি লোক। কী-এক দুর্বোধ ভাষায় চেঁচিয়ে উঠেই সে আবার ভিতরে ঢুকে গেলো। তারপরেই পর-পর উঠে এলো আটজন মুখোশ-পরা পুরুষমূর্তি ; আমরা কোনো-কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাদের টেনে হিঁচড়ে সেই ডুবোজাহাজের ভিতরে নিয়ে গেলো তারা।

৬

'কোথাকার জংলি এরা ?'

অন্ধকারের মধ্যেই পায়ের তলায় একটা লোহার সিঁড়ি অনুভব করতে পারলুম। তারপরেই টাল সামলাতে না-পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়লুম ঘুটঘুট্টি অন্ধকার একটি ঘরে ; শব্দ শুনে বোঝা গেলো মুহূর্তে পিছনের দরজা ঘটাং ক'রে বন্ধ হ'য়ে গেলো।

বেশিক্ষণ কিন্তু অন্ধকারে থাকতে হ'লো না। খানিক পরেই মাথার উপর একটি ফানুশের লণ্ঠনে বৈদ্যুতিক আলো জ্ব'লে উঠলো, তারপর নিরেট ও মসৃণ দেয়ালের একটা অংশ দরজার মতো খুলে গেলো। একটু পরেই দুটি লোক ঘরে ঢুকলো।

তাদের মধ্যে একজন যে স্বয়ং নেতা, তা মুহূর্তেই বোঝা গেলো। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময় তাঁর শরীর, যেন তা অস্মিতার প্রতিমূর্তি। শান্ত মুখের মধ্যে অদ্ভুত একটি দৃঢ়তার ছাপ রয়েছে, চোখের তারায় দুর্জয় সাহসের দীপ্তি। ঋজু তাঁর ভঙ্গি, চলাফেরায় আভিজাত্যের স্বাক্ষর ; মনে হয় বুঝি কোনো শেষ সম্রাটের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালুম।

পাণ্ডুর মুখবর্ণ, ঈষৎ বিষাদময়; দীর্ঘদেহী এই মানুষটিরও চওড়া কপাল আর কম্পমান আঙুল যেন কোনো গোপন আবেগের পরিচয় দেয়। স্বচ্ছ মর্মভেদী চোখে তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন—যেন ওই দৃষ্টি দিয়েই তিনি আমাদের ভিতরটা তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে নিতে চাচ্ছেন।

ঘরের ভিতরকার থমথমে স্তব্ধতাটা আমিই ভাঙলুম। ফরাসী ভাষাতেই আমি আমাদের দুর্দশার কাহিনী ব'লে গেলুম। কোনো কথা না-ব'লে তা তারা শুনে গেলো। সেই আভিজাত্যমণ্ডিত মানুষটির চোখে মুখে আগ্রহ ও কৌতূহলের ছাপ দেখতে পেলুম, কিন্তু তবু কেন যেন মনে হ'লো আমার ভাষা বোধহয় তাঁর দুর্বোধ ঠেকছে।

আমি তাতে মোটেই দ'মে গেলুম না। আমার অনুরোধে নেড সেই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করলে ইংরেজিতে, তারপর কোনসাইল আলেমান ভাষায়। তখনও তাদের কোনো উচ্চবাচ্য করতে না-দেখে শেষে ভাঙা-ভাঙা লাতিন ভাষারই শরণ নিলুম আমি। কিন্তু তারা তেমনি নির্বাকভাবে আমাদের লক্ষ্য ক'রে গেলো কেবল। তারপর কী-এক অদ্ভুত ও অচেনা ভাষায় কথা বলতে-বলতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

তারা চ'লে যেতেই নেড বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়লো: 'কোথাকার জংলি এরা যে পৃথিবীর কোনো সভ্য ভাষাই বোঝে না?'

নেডের গজরানি শেষ হবার আগেই আবার দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো একটি পরিচারক। অন্যদের মতো এরও মাথায় সিন্ধু-ভোঁদড়ের লোমের টুপি, সীলমাছের চামড়ার জুতো, আর কোনো অচেনা কাপড়ের পোশাক। হুবহু সেই রকমই কতকগুলি কুর্তা ও পাৎলুন সে রাখলে আমাদের সামনে। পোশাকগুলো যে আমাদের জন্যই, তা, সে না-বললেও, বুঝতে পারলুম; তৎক্ষণাৎ আমরা ভিজে পোশাক ছেড়ে এই নতুন ও অদ্ভুত পোশাক প'রে নিলুম।

এর মধ্যে পরিচারকটি টেবিলের উপর খাদ্যসম্ভার সাজিয়ে দিয়ে গেছে। চিনেমাটি আর রুপোর রেকাবিতে সারি-সারি সাজানো সে-সব

খাবার দেখে নেড ব'লে উঠলো : 'শাবাশ ! এবার তা'হলে কচ্ছপের মকুৎ, হাঙরের মুড়িঘন্ট আর কুকুর-মাছের ডিম ভাজা খেয়ে নিন—তা'হলেই তোফা হয় !'

কিন্তু নেডের এই গজরানির কোনো কারণ ছিলো না। খাবারের মধ্যে কয়েকটা কেবল অচেনা মাছ আছে। রুটি আর মদ না-থাকায় নেডের বিরক্তি চীৎকৃতভাবে প্রকাশ পেলো। আমার কিন্তু রান্নাটা সত্যি তোফা লাগলো। খাবার জলটাও বেশ টলটলে পরিষ্কার। ভোজবাড়ির খাওয়া হ'লো যেন আমাদের। আর খাওয়ার পরেই চোখ ভ'রে ঘুম নেমে এলো। শুতে-না-শুতেই ঘুমিয়ে পড়লুম তিনজনে।

৬

নটিলাস-এর কাপ্তেন নেমো

কতক্ষণ যে ঘুমিয়েছিলুম আন্দাজ নেই। ঘুম ভাঙার পর দেখলুম নেড আর কোনসাইল তখনো ঘুমে অচেতন। ঘরের ভিতরটা কেমন যেন গুমোট-মতো, নিশ্বেস নিতে কষ্ট হয়। কেমন ক'রে যে এরা ঘরের মধ্যে অক্সিজেন সরবরাহ করে তা-ই ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ এক ঝলক টাটকা সমুদ্রের হাওয়ায় মুহূর্তে ঘরের দমবন্ধকরা ভাবটা কেটে গেলো।

শুয়ে-শুয়ে কত অদ্ভুত ও বিচিত্র কথা ভাবছি, এমন সময়, নেড আর কোনসাইলেরও ঘুম ভেঙে গেলো। খুব খিদে পেয়েছিলো আমাদের। কিন্তু এই অদ্ভুত ডুবোজাহাজটির অত্যদ্ভুত লোকগুলো আবার আমাদের খেতে দেবে কি না জানি না। নেড আর কোনসাইল তো খিদেয় রীতি-মতো কাতর হ'য়ে পড়েছিলো। নেড তো ঘুম ভাঙার পর থেকেই ছটফট করছে, আর কোনসাইলও যথোচিত চেষ্টা সত্ত্বেও তার কাতরভাবটা কিছুতেই গোপন রাখতে পারছে না। নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে আমি ওদের ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু খিদের জ্বালায় নেড

তখন উন্মত্তপ্রায় ; ঘরময় দাপাদাপি শুরু ক'রে দিয়েছে সে, ক্রমাগত লাথি মারছে সেই দেয়ালে, আর সমানে চীৎকার ক'রে ডুবোজাহাজের প্রত্যেকটা আরোহীকে গোল্লায় পাঠাচ্ছে। শেষটায় ওর রকমশকম আমাকে রীতিমতো আতঙ্কিত ক'রে তুললো।

আমার এই আশঙ্কা যে মোটেই অমূলক নয়, একটু পরেই তা টের পাওয়া গেলো। কিছুক্ষণ পরে ঘরের দরজা খুলে একটি পরিচারক ঢুকতেই নেড আচমকা তার উপর খ্যাপা নেকড়ের মতো লাফিয়ে পড়লো। অমন প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে পরিচারকটি একটা পাক খেয়েই মেঝেয় ছিটকে পড়লো। অমনি নেড তার বুকের উপর চেপে ব'সে টুটি টিপে ধরলো। কেলেঙ্কারি হয় দেখে আমি আর কোনসাইল নেডকে টেনে তোলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি, এমন সময় পিছন থেকে কে যেন পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ ফরাশিতে ব'লে উঠলো : 'শান্ত হও, মিস্টার ল্যাণ্ড। প্রফেসর, দয়া ক'রে আমার কয়েকটি কথা শুনবেন কি আপনি ?'

বক্তা আর-কেউ নন, সেই অভিজাত পুরুষ, যাঁকে দেখেই আমার দলপতি ব'লে বোধ হয়েছিলো।

নেড তো এ-কথা শুনেই লাফিয়ে উঠলো। তাকিয়ে ছাখে টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, বুকের উপর হাত দুটি আড়াআড়িভাবে ভাঁজ-করা, সমস্ত ভঙ্গিমাটির মধ্যে কর্তৃত্বের ছাপ।

বিস্মিত আমার তখন স্তব্ধতা ভেঙে কথা বলার ক্ষমতা ছিলো না। তিনিই আবার বিশুদ্ধ ফরাশিতে বলতে লাগলেন, 'আমি ফরাশি, আলেমান, ইংরেজি ও লাতিন ভাষা বলতে পারি। কিন্তু তখন আমি কথা বলি নি এই জন্যেই যে আমি বুঝতে পারছিলুম না আপনারা সত্যি কথা বলছেন কিনা। পরে যখন দেখলুম চার ভাষায় বলা চারটে গল্পই এক, তখন বুঝলুম আপনারা মিথ্যে বলেন নি। আমি তো আর পৃথিবীর বাসিন্দা নই, আপনাদের ওই জগৎ থেকে নিজেকে আমি সম্পূর্ণ সরিয়ে এনেছি এই জলের তলায়, তবুও আপনারা এসেছেন আমাকে উত্ত্যক্ত করতে...'

'আমরা কিন্তু স্বেচ্ছায় আসি নি।'

'এই-যে 'আব্রাহাম লিঙ্কন' হন্যে হ'য়ে সাত সমুদ্রে আমাকে খুঁজে বেড়িয়েছে, সে কি আপনাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও? আমার জাহাজ লক্ষ্য ক'রে যে কামান ছোঁড়া হয়েছে, তা কি অনিচ্ছার সাক্ষী? নেড ল্যাণ্ড যে এই জাহাজ লক্ষ্য ক'রে হারপুন ছুঁড়েছিলো তাও কি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে?' রোষে তাঁর গলা গমগম ক'রে ওঠে। স্পষ্ট গম্ভীর স্বরে তিনি বলতে থাকেন, 'যাক, এ সম্বন্ধে আমি কোনো বাদ-প্রতিবাদ করতে চাই নে। আপনারা এখন যুদ্ধবন্দী। নেহাত দয়া ক'রে আপনাদের আমি সলিল-সমাধি থেকে বাঁচিয়েছি। নয়তো আমার জাহাজ জলের তলায় নিয়ে গিয়ে আপনাদের অকূল সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে মেরে ফেলাই কি আমার উচিত ছিলো না?'

'তা'হলে সেটা বর্বরোচিত হ'তো, কেননা কোনো সভ্যমানুষ এমন পাষাণ হ'তে পারে না,' আমি বললুম।

'প্রফেসর,' তাঁর গলার স্বর তীব্র হ'য়ে উঠলো, 'আপনারা যাকে সভ্য বলেন, আমি তা নই। ওই তথাকথিত সভ্যতার আগাপাশতলা দেখেছি আমি, জানি তার হাম্বড়া বুলি ও নৃশংস ক্রিয়াকলাপের অর্থ কী। আমাদের ওই সভ্যজগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছি আমি, আপনাদের কোনো নিয়মকানুনই আমি মানি না। আপনাকে আমি স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিচ্ছি, প্রফেসর, ভবিষ্যতে কখনো ওই সভ্যজগতের নজির আমার কাছে তুলবেন না।'

প্রচণ্ড রোষে তাঁর চোখ ঝকঝক ক'রে উঠলো। সেই গম্ভীর গমগমে গলা শুনে বুঝতে পারলুম, নিশ্চয় এই মানুষটির জীবনে কোনো ভীষণ ইতিহাস লুকিয়ে আছে। তথাকথিত আইনকানুন তিনি মানেন না; সিন্ধুতলের কোনো গভীর আইনের বাধানিষেধও তাঁকে শাসন করতে অক্ষম। বোধহয় একমাত্র বিবেক, আর ঈশ্বর ছাড়া আর-কারো সংহিতাকেই তিনি গ্রাহ্য করেন না।

'এই জাহাজে আপনাদের স্থান দিতে পারি কেবল কয়েকটি শর্তে,'

আবার কঠিন স্বরে বললেন তিনি, 'মাঝে-মাঝে এমন-সব ঘটনা ঘটবে, যা আপনাদের দেখতে দেয়া হবে না। তখন আপনাদের আমি এই ঘরে বন্দী ক'রে রাখবো। আর জীবদ্দশায় আপনারা আর সভ্যজগতে ফিরে যেতে পারবেন না।'

'অর্থাৎ আমরা বন্দী হ'য়েই থাকবো?'

'এক অর্থে তা-ই। কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই আপনারা আমার মতোই এখানে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারবেন।'

'তার মানে, জেলখানায় কোনো বন্দী ইচ্ছে করলে যেমনভাবে পায়চারি করতে পারে, আমাদেরও কেবল সেই অধিকারটুকু থাকবে?'

'সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের অর্থ আপনি যদি তা-ই করেন, তা'হলে আমি কোনো প্রতিবাদ করতে চাই না। তবে আপনাদের আমি কখনোই পৃথিবীতে ফিরে যেতে দেবো না, কেননা আপনারা আমার গোপন অস্তিত্বের কথা জেনে গেছেন। আসলে আপনাদের এখানে রেখে আমি নিজেকেই রক্ষা করার চেষ্টা করছি।'

'অর্থাৎ আপনার শর্ত মেনে না-নিলে আমাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে।'

'অগত্যা।'

'এ-কথার কোনো উত্তর নেই। তবে এই জাহাজের নেতার কাছে আমরা কোনো-কথার সূত্রে বদ্ধ নই।'

'না, তা নন।' তারপর মানুষটি অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে বললেন, 'মঁসিয় আরোনা, আপনার অন্তত এই প্রস্তাবে আপত্তি করার কিছু থাকতে পারে না। সমুদ্রের রহস্য সম্বন্ধে আপনি একাধিক বই লিখে থাকলেও আপনার জ্ঞান ও নানা অনুমান মূলত অসম্পূর্ণ। এই জাহাজে থাকলে আপনি সেই অজ্ঞাত জগৎ দেখার সুযোগ পাবেন, যার রহস্য বস্তুত এত কাল কেবল অনুমাননির্ভর ছিলো। আমাকে আপনার ধন্যবাদ দেয়া উচিত, কারণ আমার জন্যেই সিন্ধুতলের বিপুল রহস্য ভেদ করার সুযোগ পাবেন আপনি।'

প্রকৃতিবিজ্ঞানের উল্লেখ যে আমাকে দুর্বল ক'রে ফেললো, এ-কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই ; মুহূর্তের জন্ত এ-কথা ভুলে গেলুম যে স্বাধীনতার বিনিময়ে আমার বৈজ্ঞানিক কৌতূহল চরিতার্থ করার কোনো অর্থ হয় না। আস্তে তাঁকে জিগেস করলুম, 'আপনাকে কী ব'লে সম্বোধন করবো আমি।'

'কাপ্তেন নেমো।...আপনি আর আপনার সঙ্গীরা আমার কাছে 'নটিলাস' জাহাজের যাত্রী ছাড়া আর-কেউ নন।' তারপর নেড আর কোনসাইলের দিকে ফিরে বললেন, 'এখানে, এই কেবিনেই—আপনাদের খাবার দেয়া হয়েছে। এই পরিচারকটি আপনাদের দেখাশুনো করবে। ...আর মঁসিয় আরোনা, আমাদের ছোটোহাজরি প্রস্তুত। আসুন, আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই।'

দীর্ঘ করিডর পেরিয়ে আমাকে নিয়ে তাঁর খাবার-ঘরে এলেন কাপ্তেন নেমো। বিলাসবহুল মূল্যবান আশবাবপত্রে সাজানো কেবিনগুলো দেখে রীতিমতো তাজ্জব হ'য়ে যেতে হয়। যেন জলের তলায় নতুন এক অমূল্য জগতের উপর থেকে পর্দা উঠে গেলো।

বিস্তর খাবার সাজানো ছিলো টেবিলের উপর, কিন্তু সবই আমার অচেনা। আমার চোখমুখে কৌতূহলের ছাপ ফুটে উঠতে দেখে কাপ্তেন নেমো বললেন, 'বেশির ভাগ খাবারই আপনার অচেনা ঠেকবে, মঁসিয় আরোনা। কারণ যা-কিছু দেখছেন, সবই সিন্ধুতলের অবদান। পৃথিবীতে আপনারা যে-খাত্ত গ্রহণ করেন, বহুদিন হ'লো আমি তা ত্যাগ করেছি, কিন্তু এই খেয়েই বেশ সুস্থ ও শক্ত আছি—কোনো অস্বাচ্ছন্দ্যই বোধ করি না।'

'এইসব খাবারই তবে সমুদ্রের দান ?'

'হ্যাঁ, প্রফেসর। সমুদ্রই আমার যাবতীয় চাহিদা মেটায়। কখনো জাল ফেলে সব জোটাই আমি, কখনো দলবল নিয়ে জলের তলায় বেরোই শিকারে। ওটা কচ্ছপের মাংস ভাজা, আর এটা শুশুকের যকৃৎ—খেতে অনেকটা শুয়োরের মাংসের মতো লাগবে। আর এটা

হ'লো তিমিমাছের দুধ থেকে তৈরি পনির। চিনি বানিয়েছি উত্তর সাগরের সমুদ্রের শ্যাওলা থেকে।' কাপ্তেন নেমো বলতে থাকেন, 'প্রফেসর, সমুদ্র কেবল আমাকে আহার্যই জোগায় না, বসনভূষণও দেয়। আপনি তো জানেন ঝিনুক শামুক গুগলি প্রভৃতি কতগুলো সামুদ্রিক প্রাণী এক ধরনের সূক্ষ্ম রেশমের মতো তন্তু দিয়ে নিজেদের বেঁধে রাখে—এই আঁশকে বলে বাইসাস। আপনি যে-পোশাক প'রে আছেন, তা এই বাইসাস থেকে তৈরি। ভূমধ্যসাগরের কয়েকটি কঠিনবর্ম প্রাণীর দেহের রঙে এই পোশাক রঙ-করা হয়েছে। আপনার শয্যায় পাতা আছে সমুদ্রের সবচেয়ে নরম ঘাস। লেখার জন্য পাবেন তিমিমাছের হাড়ের কলম, আর যে-কালি দিয়ে আপনি লিখবেন তা কালামারির দেহ-নিংড়োনো কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ।'

'সমুদ্রকে আপনি ভালোবাসেন, কাপ্তেন?'

'বাসি। সমুদ্রই আমার সব, সর্বস্ব। তার হাওয়া শুদ্ধ, স্বাস্থ্যময়। সমুদ্র হচ্ছে বিপুল একটা মরুভূমির মতো, যেখানে মানুষ কখনোই একা বোধ করে না, কারণ তার চারপাশে সে অনুভব করে প্রাণের স্পন্দন—এক অনিঃশেষ প্রাণস্রোত সেখানে অনন্ত বহমান। সমুদ্রে স্বৈরাচারীর স্থান নেই—তারা হানাহানি ক'রে মরে ডাঙায়, জলের উপরে; ত্রিশ বাঁও নিচে তাদের কোনো ক্ষমতাই নেই। প্রফেসর, জলের মধ্যে থাকুন দেখবেন স্বাধীনতা কেবল এই সিন্ধুতলেই আছে। এই সিন্ধুতলে কোনো স্বৈরাচারী প্রভু নেই, সেখানেই আমি আমার স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে পারি, সেখানেই আমি স্বাধীন, আত্মপ্রভু!' কথা বলতে-বলতে প্রবল আবেগে উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন কাপ্তেন নেমো; উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন তিনি। কিন্তু একটু পরেই আবার নিজেকে তিনি সামলে নিলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আসুন মঁসিয়ে আরোনা, চলুন—আপনাকে আমার 'নটিলাস' ঘুরিয়ে দেখাই।'

৭

রাজা ও সন্ন্যাসী

ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে কী দেখিয়েছিলেন "নটিলাস"-এ ? সব-কিছু। হয় এই ছোট্ট উত্তরটিতে পাঠকদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে, আর নয়তো এ-তথ্যটা মনে রাখতে হবে যে পাতার পর পাতা জুড়ে লিখলেও এই বিচিত্র ডুবোজাহাজটির ভিতরকার স্বয়ম্পূর্ণ পৃথিবীর বর্ণনা কিছুতেই সম্পূর্ণ হবে না। দেখেছিলুম মস্ত গ্রন্থাগার—সব ভাষার সব রুচির বই সাজানো আছে থরে-থরে, তবে সংখ্যায় বিজ্ঞানের বই-ই বেশি ; দর্শন, পুরাণ, কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস—এদেরও তাই ব'লে অবহেলা করা হয় নি। দেখেছিলুম এমন-এক বিচিত্রাভবন বা সংগ্রহশালা, সারা ইয়োরোপে যার কোনো তুলনা মিলবে না, যা এমন কি কল্পনাকেও অনায়াসে ছাড়িয়ে যায়। যাবতীয় দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য বস্তু তো আছেই, তাছাড়াও ছিলো এমন অনেক বস্তু, যার সন্ধান পৃথিবীর কোনো বিজ্ঞানীই এখনো পায় নি। আর দেখেছিলুম রত্নশালা—যেখানে নানা রঙের নানা আকারের ছোটো-বড়ো অসংখ্য মূল্যবান মুক্তো জমিয়ে রাখা হয়েছে।

এই সংগ্রহের পিছনে যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে, তার সামান্য একভাগও সাত রাজাকে ফতুর ক'রে দিতে পারে। অথচ এই অসীম ধনবান মানুষটির শয়নকক্ষ আমাকে আশ্চর্য করেছিলো সবচেয়ে বেশি। এ যেন কোনো সন্ন্যাসীর ঘর—নিরাবরণ ও নিরাভরণ ; একটা লোহার খাট, একটা ছোট্ট টেবিল, আর হাত ধোবার একটা বেসিন ছাড়া আর-কিছুই নেই। এই অতুল ঐশ্বর্যের পাশেই এই সুকঠোর তপশ্চর্যা তাঁর সম্বন্ধে কি-রকম যেন দুর্বল ক'রে ফেললে আমাকে।

তারপরে এই বিদ্রোহী মানুষটি আমাকে 'নটিলাস'-এর সব যন্ত্রপাতি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। নাবিকরা যে-সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তাঁর

কোনোটা তাঁর সংগ্রহ থেকে বাদ যায় নি।

'নটিলাস'-এর যে-দানবিক শক্তি সাত সমুদ্রকে কাঁপিয়ে তুলেছে, তার মূল হ'লো বিদ্যুৎ। সমুদ্রজল থেকে সোডিয়াম নিষ্কাশন ক'রে অত্যন্ত অনায়াসে ও শস্তায় অফুরন্ত বিদ্যুৎ-শক্তি বানিয়ে নেয় 'নটিলাস'। তার প্রচণ্ড গতিবেগ, আলো আর উত্তাপের উৎসই হচ্ছে এই অফুরান বিদ্যুতের ভাণ্ডার—সিন্ধুতল। শক্তিশালী পাম্প দিয়ে বাতাস-ঘরে প্রচুর ঘন-বাতাস জমিয়ে রাখতেন কাপ্তেন নেমো, যাতে জলের তলায় একটানা অনেক দিন থাকতে হ'লেও কোনো অসুবিধে না-হয়। বিদ্যুৎচালিত ঘড়ি, জাহাজের গতিমাপক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, জলস্তরের তাপমাত্রা মাপবার তাপমান যন্ত্র, বহু অতিরিক্ত গীয়ার প্রভৃতি নানাবিধ জিনিশ তিনি এক-এক ক'রে দেখালেন আমাকে।

'নটিলাস'-এর ঠিক মাঝখানে একটা কুয়োর মতো খাড়া সুরঙ্গ দেখতে পেলাম। কুয়োর উপরে ঘোরানো-সিঁড়ি উঠে গেছে। এটা যে কী, বা কেন এটা আছে—কিছুই আমি বুঝতে পারছিলুম না। আমার কৌতূহলী চাহনি দেখে কাপ্তেন নেমো জানালেন, 'উপরে আমার নৌকো আছে, প্রফেসর।'

'তাই নাকি? কিন্তু নৌকোয় চড়তে হ'লে নিশ্চয় "নটিলাস"কে জলের উপর নিয়ে যেতে হয়।'

'মোটেই না। নৌকোর উপরে-নিচে দুটি ঢাকনি আছে। নিচেরটা বন্ধ ক'রে বাঁধন খুলে দিলেই, ছিপির মতো, নৌকো জলের উপর ভেসে ওঠে। তারপর পাটাতনের উপরকার ঢাকনি খুলে মাস্তুল লাগিয়ে পাল তুলে দাঁড় টানলেই হ'লো।'

'কিন্তু ফিরে আসেন কী ক'রে?'

'আমি আসি না, বরং "নটিলাস"ই আমার কাছে যায়। বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে বার্তা পাঠালেই জাহাজ চ'লে যায় আমার কাছে।'

'নটিলাস'-এর আরেক দিকে গিয়ে সমুদ্রের নোনাজল পরিশ্রুত ক'রে টলটলে পানীয় জল তৈরি করার ব্যবস্থা দেখলুম। ইঞ্জিন-ঘরটা

ছিলো সবচেয়ে পিছনে। এখান থেকেই প্রচণ্ড বেগ লাভ ক'রে 'নটিলাস' এর প্রপেলার ঘুরিয়ে ঘণ্টায় এমন কি পঁয়তাল্লিশ নট বেগেও জাহাজ চালানো যায়।

সব দেখে-শুনে আমরা আবার গ্যালারি-ঘরে ফিরে এলুম। একটি সোফায় বসতে-বসতে বললুম, 'কাপ্তেন নেমো, সবই দেখতে পেলুম, কিন্তু এখনো অনেক তথ্যই আমার কাছে গোপন ও রহস্যময় থেকে গেলো।'

আমার দিকে একটি সিগার বাড়িয়ে দিলেন কাপ্তেন নেমো। 'নিন, আপনি নিশ্চয়ই ধূমপান করেন।'

'সে কি! আপনারা এখানে চুরুটও খান নাকি?'

'নিশ্চয়ই!'

'তাহ'লে এখনো নিশ্চয়ই হ্যাভানার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন আপনি?'

'না, তা রাখি নি। চুরুটটা যদিও হ্যাভানার নয়, তবু তা আপনার ভালো লাগবে ব'লে আশা করি।'

সোনালি রঙের চুরুটটা জ্বালিয়ে বুক ভ'রে ধোঁয়া নিলুম আমি। 'চমৎকার চুরুট। কিন্তু তামাক আছে ব'লে তো মনে হয় না।'

'না। এই তামাক হ্যাভানারও নয়, ব্রহ্মদেশেরও নয়। আসলে এটা সমুদ্রেরই একরকম শ্যাওলা—নিকোটিনে ভর্তি। অবশ্য এই শ্যাওলা খুব-যে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়, তা নয়। আপনার যদি এই চুরুট ভালো লেগে থাকে, তাহ'লে আপনি যত-ইচ্ছে তা খেতে পারেন।'

চুরুট খেতে-খেতেই আমি আবার বললুম, 'নটিলাস'-এর রহস্য এখনো আমার কাছে গোপন থেকে গেলো, ক্যাপ্টেন।'

ক্যাপ্টেন নেমো আমার দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে বললেন, 'কোনো রহস্যই আপনার গোপন থাকবে না, ম'সিয় আরোনা; সবই আপনাকে খুলে বলবো, কারণ 'নটিলাস' থেকে আমার এই গোপন খবর নিয়ে কোনোদিনই আর সভ্যজগতে ফিরে যেতে পারবেন না আপনি!'

একটু থেমে তিনি সব বিশদ করলেন, 'ম'সিয় আরোনা, 'নটিলাস'-এর দৈর্ঘ্য পঁচাত্তর গজ। পুরো জাহাজটা দু-দুটো ইস্পাতের খোলে মোড়া আছে; একটা ইস্পাতের পাতের উপর আরেকটা ইস্পাতের পাত বসানো ব'লে যে-কোনো ভীষণ আঘাতও অনায়াসে প্রতিহত ও উপেক্ষা করতে পারে 'নটিলাস'। জাহাজের ভিতরে মস্ত কয়েকটা ট্যাঙ্ক আছে—ডুব দেবার সময় পাম্প ক'রে ওই জলাধারগুলো ভ'রে নিই। কখনো খুব গভীরে নামতে হ'লে 'নটিলাস' অবশ্য হাইড্রোপ্লেনের সাহায্যে কোণাকুণিভাবে জল কেটে নামতে পারে।'

'কিন্তু জলের তলায় চালক পথ দেখবে কেমন ক'রে? সিন্ধুতলে তো আর সূর্য ওঠে না!'

'মস্ত একটা ঘুলঘুলি বসানো স্তম্ভের মধ্যে চালক আর হুইল থাকে —দেয়ালের গায়ে আবার টেলিস্কোপও বসানো আছে। দু-পাশ থেকে তীব্র বিদ্যুতের আলোয় সমুদ্রের জল দিনের মতো ঝলমল করতে থাকে।'

'ও, তাহ'লে এই আলোকেই আমরা সিন্ধুদানবের গা থেকে ছড়িয়ে-পড়া ফসফরাসের দীপ্তি ব'লে মনে করেছিলুম। কিন্তু 'স্কটিয়া' জাহাজকে আপনি খামকা হঠাৎ জখম করতে গেলেন কেন?'

'সেদিন 'নটিলাস' মাত্র এক বাঁও তলা দিয়ে যাচ্ছিলো। তাইতেই হঠাৎ 'স্কটিয়ার' খোলে ধাক্কা লেগে যায়।'

'আর 'আব্রাহাম লিঙ্কন'?'

'ম'সিয় আরোনা, এটা ভুলে যাবেন না যে 'আব্রাহাম লিঙ্কন' আমাকে আক্রমণ করেছিলো, তাই আত্মরক্ষার জন্যই আপনাদের জাহাজকে কেবল বিকল ক'রে দিয়েছিলুম, ডুবিয়ে দিই নি।'

আমি তক্ষুনি প্রসঙ্গ পাল্টে ফেললুম। তাছাড়া 'নটিলাস'-এর সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা ও বিস্ময় তখন অসীমে পৌঁছেছিলো। জিগেস করলুম, 'আচ্ছা, এত বড়ো জাহাজটা এত গোপনে আপনি তৈরি করলেন কোথায় যে কাকপক্ষীও তার কথা টের পেলো না?'

'একটা নির্জন দ্বীপে। টুকরো-টুকরো অংশগুলো আমি এক জায়গায় কিনি নি—তাহ'লে লোকের সন্দেহ হ'তে পারতো। নানা দেশ থেকে নানা অংশ আনিয়েছিলুম আমি—খোলটা এসেছে ক্লাল থেকে, লণ্ডন থেকে চাকার রড, লিভারপুল থেকে ইস্পাতের বর্ম, গ্লাসগো থেকে আস্ত চাকাটা, ট্যাঙ্কগুলো বানিয়েছিলুম পারীতে, জর্মানিতে ইঞ্জিন, সুইডেনে সামনের অংশটা, আর নিউ-ইয়র্কে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিগুলো। প্রত্যেকটা কারখানায় ভিন্ন-ভিন্ন নামে নক্সা আর খশড়া পাঠিয়েছিলুম। তারপর একটা নির্জন দ্বীপে সব জুড়ে দিয়ে তৈরি হ'লো 'নটিলাস'। তারপর 'নটিলাস' নিয়ে অকূল পাথারে ভেসে-পড়ার আগে আগুন দিয়ে সব-কিছু একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছিলুম, যাতে কোনোদিন আপনাদের সভ্যজগৎ এর-কিছু টের না-পায়।'

'আপনার ঐশ্বর্যের নিশ্চয়ই সীমা নেই—'

'সত্যি সীমা নেই, প্রফেসর। ফরাশিদের জাতীয়-ঋণ আমি অনায়াসে—নিজের একটুও অসুবিধে না-করে—মিটিয়ে দিতে পারি।'

ক্যাপ্টেন নেমো কথাটা এমন নির্বিকারভাবে বললেন যে আমি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম। তিনি কি তাহ'লে আমাকে উজবুক বানাতে চাচ্ছেন?

৮

অতল জলের পথিক

'এবার, প্রফেসর,' ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, 'আমাদের সমুদ্র যাত্রা শুরু হবে; আবার একবার আস্ত পৃথিবী ঘুরে আসবে 'নটিলাস' সমুদ্রের তলা দিয়ে। আমাকে গিয়ে যাত্রার ব্যবস্থা করতে হয়। এখন আমরা পারীর মধ্যরেখার ৩৭°১৫´ পশ্চিম দ্রাঘিমা আর ৩০°৭´ অক্ষরেখায় আছি। এখান থেকেই আজ নভেম্বরের আট তারিখে দ্বিপ্রহরে আমাদের

সমুদ্রতল অভিযান শুরু হবে। আসলে আমরা এখন জাপানের উপকূল থেকে তিনশো মাইল দূরে রয়েছি। আপনি বরং এখানেই বসুন, আমি ইঞ্জিনঘর থেকে ঘুরে আসি।'

ক্যাপ্টেন নেমো চ'লে গেলেন। আমি একা ব'সে-ব'সে এই রহস্যময় মানুষটির কথা ভাবতে-ভাবতে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লুম। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে অতীতের স্মৃতি তাঁর পক্ষে অত্যন্ত বেদনাময়; তাঁর আর্ত পাণ্ডুর মুখচ্ছবিতে বিষণ্ণ অথচ উজ্জ্বল চোখ দুটি যেন অত্যন্ত সযত্নে কোন দূর দিনকে লুকিয়ে রাখতে চাচ্ছে। মানুষটি স্বাধীনচেতা; যতক্ষণ কথা হ'লো ততক্ষণই কেবল স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করেছেন বারে-বারে। তবে কি তিনি কোনো পরাধীন দেশের মানুষ? কোন দেশের মানুষ তিনি আসলে? কেন তিনি পৃথিবীকে এমন ঘৃণা করেন? কেন এই মানবজাতি সম্বন্ধে তাঁর অবজ্ঞা ও ঘৃণার শেষ নেই? কেন তাঁর গলার স্বর মাঝে-মাঝে অমন তীব্র ও ভীষণ হ'য়ে ওঠে?

কতক্ষণ ধ'রে যে এ-সব কথা ভাবছিলুম বলতে পারবো না। হঠাৎ অন্যমনস্কভাবে চোখ গিয়ে পড়লো টেবিলের উপরকার মস্ত ভূগোলক-টার উপর। তারপর ভালো ক'রে তাকিয়ে আঙুল রেখে দেখলুম আমরা কোনখানে রয়েছি—কোনখানে ওই দ্রাঘিমা আর অক্ষরেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে।

ডাঙায় যেমন নদী থাকে, তেমনি থাকে সিন্ধুতলেও। তাপমাত্রা আর বর্ণলেপের তারতম্য থেকেই এই বিশেষ স্রোতগুলোকে শনাক্ত করতে হয়! এদের ভিতর সবচেয়ে বিখ্যাত হ'লো গালফ স্ট্রীম। এই স্রোত ধ'রেই আমরা এখন ছুটে চলেছি। নিপ্পনীরা এই সিন্ধু-নদীকে বলে কুরো-শিভো অর্থাৎ কালো নদী। বঙ্গোপসাগর থেকে বেরিয়ে এই স্রোত মালাক্কা প্রণালী অতিক্রম ক'রে এশিয়ার উপকূল ধ'রে এগোতে-এগোতে একেবারে উত্তর-প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পড়ে। এই সামুদ্রিক স্রোতটির রঙ এত গাঢ়-নীল যে প্রায় কালো ব'লেই বোধ হয়। আর এই স্রোত যে শুধু কালো তা-ই নয়, বেশ উষ্ণও বটে। ভূগোলকটির

উপর আঙুল রেখে এই কালো নদীর গতিপথ দেখছি, এমন সময়ে ঘরে ঢুকলো নেড আর কোনসাইল।

সংগ্রহশালাটি দেখেই দুজনে বিস্ময়ে হতবাক। কিন্তু নেড ল্যাণ্ড ডাকাবুকো একরোখা-লোক ; তা-দেখে সহজে ভুলবে কেন ? কী ক'রে এই 'নটিলাস' নামক জেলখানা থেকে পালানো যায়, সেই চিন্তাই তখন তার কাছে একমাত্র। কথাবার্তার মধ্যেও বারে-বারে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই প্রসঙ্গই উত্থাপন করছে।

এমন সময় হঠাৎ সব অন্ধকার হ'য়ে গেলো। নেড ল্যাণ্ড কী-একটা কথা বলতে চাচ্ছিলো, কিন্তু হঠাৎ এই গভীর অন্ধকার নেমে এলো ব'লে তার মুখের কথা মুখেই র'য়ে গেলো। কী যে করবো কিছুই বুঝতে পারছিলুম না। এই অন্ধকার কি কোনো ভীষণ অমঙ্গলের সংকেত, না কি 'নটিলাস'-এর যাত্রার সূচনা—তা আমাদের কাছে স্পষ্ট ছিলো না। শুধু একটা ঘড়ঘড়ে শব্দ ছাড়া আর-কোনো সাড়া-শব্দ নেই। নেড ল্যাণ্ড শুধু বললে, 'এবার সব শেষ !'

আচমকা সেলুনের দু-পাশে দুটি আয়তাকার কাচের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল আলো দেখা দিলো। অমনি সিন্ধুতল ঝলমল হ'য়ে উঠলো, ওই পুরু কাচ ছাড়া আমাদের সঙ্গে সমুদ্রের আর-কোনো ব্যবধান রইলো না।

এই কাচের ওপাশে যে-অপরূপ দৃশ্য ফুটে উঠলো, তা কোনোদিনই ভোলবার নয়। প্রকৃতির হাতে-গড়া এক বিপুল জলাধারে আলো এসে পড়লো, আর উদ্‌ঘাটিত ক'রে দিলো এক বিস্ময়কর দৃশ্য, যেখানে প্রাণের স্রোত ব'য়ে চলেছে অবিশ্রাম, যেখানে সবুজ শ্যাওলার ফাঁকে-ফাঁকে স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন মাছেরা খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে—কত বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন রূপের, বিভিন্ন আকারের মাছ ! আলোর রেখা যেন তাদের টান দিয়েছিলো ! তাই আকৃষ্ট হ'য়ে ছুটে এসেছিলো অগুন্তি মাছের ঝাঁক। যেন কোনো তৃতীয় নয়ন চোখের সামনে থেকে কোন-এক বিশ্রী পর্দা তুলে দিয়ে আশ্চর্যকে উন্মোচন ক'রে দিলে। আমি যখন মুগ্ধ বিস্ময়ে এই আশ্চর্য দৃশ্যে তন্ময় হ'য়ে আছি, নেড কিন্তু তখন এই মৎস্যকুলের

মধ্যে কোনটা সুখাদ্য এবং কোনটা অখাদ্য তা-ই নিয়ে মহা-সমস্যায় পড়েছে।

প্রায় দু-ঘণ্টা ধ'রে এই আশ্চর্য মৎস্যবাহিনীকে দেখে গেলুম আমি। চেনা-অচেনা মাছের বাহিনী 'নটিলাস'-এর আলোর রেখা ধ'রে ছুটে এলো তার পিছন-পিছন : ম্যাকারেল, স্যালাম্যাণ্ডার, সারমুলেট, সিন্ধু-সাপ—কত কি! তারপর হঠাৎ সেই পুরু কাচের জানলা বন্ধ হ'য়ে গেলো, আর সেলুনের মধ্যে উজ্জ্বল আলো জ্ব'লে উঠলো। সে-অপরূপ দৃশ্য হারিয়ে গেলো মুহূর্তে। কিন্তু অনেক পরেও আমার ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে হানা দিলো সেই সব উজ্জ্বল মসৃণ বিকট-সুন্দর মৎস্যবাহিনী—সমুদ্রের সেই স্পন্দমান বাসিন্দারা, 'নটিলাস'-এর কাচের জানলা দুটি কোনো তৃতীয়-নয়নের মতো হ'য়ে আমার সামনে যাদের চাঞ্চল্য, স্পন্দন ও খেলা উন্মোচিত ক'রে দিয়েছিলো।

৯

সিন্ধুতলের মৃগয়া

পর-পর সাতদিন ক্যাপ্টেন নেমোর কোনো পাত্তাই পাওয়া গেলো না। একবারও তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লো না আমাদের, কোনো কথা হ'লো না; একা-একা ঘুরে বেড়ালুম তাঁর গ্রন্থাগারে ও সংগ্রহশালায়; আর 'নটিলাস' ছুটে চললো সেই সিন্ধুতলের চঞ্চল স্রোতের মধ্য দিয়ে তার নির্দিষ্ট পথ ধ'রে।

ক্যাপ্টেন নেমোর কোনো দেখা না-পেয়ে নেড আর কোনসাইল বেশ বিচলিত হ'য়ে পড়লো। তাহ'লে এই আশ্চর্য মানুষটি হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন? না কি আমাদের সম্বন্ধে তাঁর মত আর সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয়েছে? আমার মনে হ'লো হঠাৎ আড়ালে চ'লে যাওয়াটাও বুঝি তাঁর রহস্যময় স্বভাবের একটা বিশেষ দিক—নিজের চারপাশে কোনো দেয়াল

ছুলে দিতেই তিনি বুঝি ভালোবাসেন। জানি না কেন এই মানুষটি আমার সমস্ত চেতনাকে যেন নাড়িয়ে দিয়েছেন।

হঠাৎ বোলোই নভেম্বর আমার কামরায় টেবিলের উপর তাঁর একটি চিরকুট পেলুম। অনেকটা আলেমান হরফের ধরনে লেখা চিঠিটা, গথিক-ভঙ্গির হস্তলিপি। চিরকুটে লেখা :

'অধ্যাপক আরোনা সমীপেষু, 'নটিলাস' জাহাজ।

ক্রেসপো আইল্যাণ্ডের জঙ্গলে আগামী কাল প্রাতঃকালে ক্যাপ্টেন নেমো শিকারে যাবেন ব'লে স্থির করেছেন। এই মৃগয়ায় তিনি অধ্যাপক আরোনা ও তাঁর সঙ্গীদের সাহচর্য পেলে অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করবেন।'

নেড আর কোনসাইল তো এই আমন্ত্রণ পেয়ে উল্লসিত হ'য়ে উঠলো। অনেকদিন পরে পায়ের তলায় শক্ত মাটি পাওয়া যাবে—এটা কি কম আনন্দের কথা!

কিন্তু তাদের এই আনন্দ পরের দিনই মিলিয়ে গেলো, যখন পরদিন সকালে ছোটোহাজরির সময় খাবার-টেবিলে ক্যাপ্তেন নেমোর সঙ্গে দেখা হ'লো। তখন স্পষ্ট ক'রে জানা গেলো, আমরা ক্রেসপো আইল্যাণ্ডে যাচ্ছি বটে, কিন্তু তা দ্বীপের উপরে নয়, নিচে, জলের তলায়। সিন্ধু-তলের সেই সুন্দরবনের অধীশ্বর ক্যাপ্তেন নেমো; সেখানেই আমরা বন্দুক নিয়ে পায়ে হেঁটে শিকারে বেরোবো!

'জলের তলায়? পায়ে হেঁটে শিকার? বন্দুক নিয়ে?' আমার বিস্ময় অস্ফুট কতগুলি কথায় মুখর হ'য়ে উঠলো।

'প্রফেসর, আপনি ভাবছেন যে লোকটা বুঝি পাগল, তাই না? তা যদি ভেবে থাকেন তাহ'লে আপনি আমার সম্বন্ধে ভুল ভেবেছেন। আমার মতো আপনিও নিশ্চয়ই জানেন যে জলের তলাতেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, যদি সে নিজের সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ হাওয়া নিয়ে যেতে পারে। আমাদের সঙ্গে প্রচুর হাওয়া থাকবে—সিলিণ্ডারের মধ্যে সংনমিত বাতাস নিয়ে যাবো আমরা। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়

এই বাতাস তৈরি হবে, একটা বিশেষ ধরনের ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে এই ঘন বাতাসকেই হালকা করা হবে, এবং তাই আপনার নাকে পৌঁছোবে। মাথাটা ঢাকা থাকবে ডুবুরিদের মতো পিতলের বর্তুল শিরস্ত্রাণে। এই বন্দোবস্তে অন্তত ন-দশ ঘন্টা বাতাস সরবরাহ করা যাবে।'

'কিন্তু জলের তলায় আপনি দেখতে পাবেন কী ক'রে?'

'কেন? কোমরবন্ধে বৈদ্যুতিক মশাল বাঁধা থাকবে।'

'আর বন্দুক? জলের তলায় বন্দুক কাজে লাগবে কী ক'রে?'

'প্রফেসর, এ সাধারণ বন্দুক নয়! সংনমিত বাতাসের চাপে এর গুলি ছুটে চলে—গুলিগুলো সব বৈদ্যুতিক। শিকারেব গায়ে লাগলেই বোমার মতো ফেটে যায়। এককেটা বন্দুকে এ-রকম দশটা ক'রে গুলি থাকে।'

ছোটোহাজরি শেষ ক'রে আমরা ডুবুরি-পোশাকের ঘরে গেলুম। ঘরটা ইঞ্জিনঘরের পিছনে। সেখানে দেয়ালে গোটা বারো পোশাক ঝুলছে। এই ডুবুরি-পোশাকের পরিকল্পনা যিনি করেছেন, তাঁর সৃজনী-প্রতিভার তারিফ না-ক'রে পারা যায় না। তামার পাতার উপর খুব পুরু রবারের প্রলেপ লাগানো এই পোশাকের আগাগোড়া কোথাও শেলাই নেই। পা ছুটো ক্রমশ সরু হ'য়ে নেমে এসেছে শিশে-দিয়ে-ভারি-করা পুরু ছুটো জুতোর মধ্যে; হাতের দস্তানাও ওইভাবেই পরতে হয়। ক্যাপ্টেন নেমোর অনুচরদের সাহায্যে কোনোরকমে এই মস্ত ভারি পোশাক পরা গেলো। তারপব পিতলের শিরস্ত্রাণ আঁটার পালা: পিতলের কলারের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে ওই ভারি শিরস্ত্রাণ এঁটে দেয়া হ'লো। শিরস্ত্রাণের মধ্যে তিনটে পুরু কাচের জানলা রয়েছে, যাতে আশেপাশে বা সামনে তাকাতে কোনো অসুবিধে না-হয়। নিশ্বেস নিতেও কোনো-রকম কষ্ট হ'লো না। তারপরে আমরা এক অদ্ভুত ধরনের বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে জলের তলায় শিকারে বেরোবার জন্য তৈরি হ'য়ে নিলুম।

পোশাকটা এতই ভারি যে নড়াচড়ার কোনো ক্ষমতাই ছিলো না। আমাদের ওরা ঠেলেঠুলে পাশের ছোট্ট কোঠাটায় ঢুকিয়ে দিলে; ক্যাপ্টেন নেমোও আরেকজন ডুবুরি-পোশাক পরা অনুচর নিয়ে

আমাদের সঙ্গে এলেন। তারপর ঘরটা অন্ধকার হ'য়ে গেলো। সঙ্গে-সঙ্গে শোঁ-শোঁ ক'রে একটা শব্দ উঠলো অন্ধকারে; অনুভব করলুম যে পায়ের তলা থেকে একটা ঠাণ্ডা স্রোত উপরে উঠে আসছে। বুঝতে পারলুম, ছোট্ট কোঠাটিতে জল ঢুকছে; দেখতে-দেখতে ঘরটা জলে ভ'রে গেলো। তারপরেই খুলে গেলো একটা ভারি ঢাকনার মতো দরজা। উজ্জ্বল সবুজ আলো জ্ব'লে উঠলো পাশে। পরক্ষণেই ডুবো-জাহাজের ভিতর থেকে আমরা বেরিয়ে এসে সমুদ্রের তলায় এসে নামলুম।

ক্যাপ্টেন নেমোই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। মাঝখানে রইলুম আমি আর কোনসাইল—সকলের পিছনে রইলো ক্যাপ্টেন নেমোর সেই অনুচর। নীলচে আলোয় একশো ফুট পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। তারপরেই নীল কুয়াশায় সব ঢাকা প'ড়ে আছে। এত ভারি পোশাক প'রে জলের নিচে হাঁটতে মোটেই অসুবিধে হচ্ছিলো না, বরং বেশ হালকা লাগছিলো—আর কেমন যেন নতুন-এক মজার অনুভূতি হচ্ছিলো। বেলা তখন দশটা হবে। সূর্যের আলো জলের মধ্যে প্রতিসরিত হ'য়ে মসৃণ বালির উপর থেকে ঠিকরে পড়ছিলো। তারও কিছুক্ষণ পরে সূর্যকিরণ টেরচাভাবে জলের মধ্যে প্রবেশ করলো—আর তেকলা কাচের মধ্য থেকে যেমন সাত রঙে ভেঙে আলো বিচ্ছুরিত হয় তেমনিভাবে বর্ণালির মতোই তা সাত রঙে ভেঙে গেলো। এর সেই সাত রঙের স্নিগ্ধ সুষমা সিন্ধুতলের এই আশ্চর্য জগতে যেন কোনো অপূর্ব স্বপ্নলোক সৃষ্টি ক'রে গেলো। কত বিচিত্র উদ্ভিদ, গুল্ম, কঠিন আঁশে ঢাকা প্রাণী—যেন বর্মাবৃত, আর কত অগুন্তি ধরনের মাছ যে চোখে পড়লো, তার কোনো ইয়ত্তা নেই! সেই নীল আলো-অন্ধকারের মধ্যে, 'নটিলাস'কে ধীরে-ধীরে অনেক পিছনে ফেলে আমরা স্বপ্নের মতো সুন্দর এক অস্পষ্ট দেশে অনেক-বাঁও জলের তলায় এগিয়ে গেলুম, যেখানে শ্যাওলা-শামুক-হাড়ের পাকে-পাকে আশ্চর্য ও ঐশ্বর্যময় সিন্ধু-রূপান্তরে কালক্রমে সমস্ত কিছুই বদলে যায়।

বেলা একটা নাগাদ ক্রেসপো আইল্যাণ্ডের জঙ্গলে প্রবেশ করা গেলো। সিন্ধুতলের সেই আশ্চর্য অরণ্যের মধ্যে কোন রহস্ত লুকিয়ে আছে কে জানে। মস্ত গাছপালার মতো বিরাট-বিরাট উদ্ভিদ সোজা উঠে গেছে উপরে; ছোটখাটো গুল্ম থেকে শুরু ক'রে গাছের ডাল-পালারও এই ঊর্ধ্বমুখ বৃদ্ধি সত্যি লক্ষ্য করার মতো। ডাঙার উপরে জঙ্গলে যেমন কত জানা-অজানা ফুল পাপড়ি ছড়িয়ে দেয় তেমনি ফুটে উঠেছে সামুদ্রিক উদ্ভিদ সী-অ্যানিমোন—পাপড়ির মতো ছড়িয়ে-পড়া ডালেপালায় যেমন গুঞ্জন ক'রে খেলা করে পাখিরা, তেমনি সেখানে খেলা করছে নানা রঙের চঞ্চল মাছেরা। ক্যাপ্টেন নেমোর নির্দেশে বিশ্রাম করার জন্য সেখানেই আমরা ব'সে পড়লুম। কখন যে ক্লান্তির মধ্যে তন্দ্রা নেমে এসেছিলো জানি না; ঘুম ভাঙতেই দেখি আমার সামনেই ক্যাপ্টেন নেমো টান হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আড়মোড়া ভাঙতে গিয়েই চোখে পড়লো প্রথমে। দেখি, এক গজ উঁচু একটি অতিকায় সামুদ্রিক মাকড়শা গনগনে চোখে রাজ্যের ক্রুরতা নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওৎ পেতে থাকার ভঙ্গি ডাঙার হিংস্র প্রাণীদের মতোই—এই মূর্তিমান বিভীষিকাটি যে মুহূর্তে প্রচণ্ডভাবে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, তা বুঝতে আমার মোটেই দেরি হ'লো না—আর তাতেই আমার চটকা ভেঙে গেলো। ধড়মড় ক'রে উঠে দাঁড়ালুম। কোনসাইল আর ক্যাপ্টেন নেমোর অনুচরটিও তক্ষুনি উঠে দাঁড়ালে। ক্যাপ্টেন নেমোর ইঙ্গিতে তাঁর অনুচরটি তার বন্দুকের কুঁদো দিয়ে এক বিষম আঘাত হানলে এই অষ্টভুজ মাকড়শাটিকে, বাস, পরমুহূর্তেই সেই দানবিক কীটটার আট বাহু কিলবিল ক'রে কুণ্ডলী পাকিয়ে গেলো যন্ত্রণায়—প্রচণ্ডভাবে ছটফট করতে লাগলো সে।

আবার এগিয়ে চললুম আমরা। ক্রমশ ঢালু হ'য়ে নেমে যাচ্ছে সিন্ধুতলের জমি। সেই গাঢ়-নীল কুয়াশাও ক্রমশ সব-কিছু ঢেকে ফেলেছে। এখানে এসেই ক্যাপ্টেন নেমো বৈদ্যুতিক লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিলেন। বল্লমের মতো আলোর ফলা অন্ধকারকে আক্রমণ ক'রে হঠিয়ে

দিলে। তারপরেই সামনে তাকিয়ে দেখি গ্র্যানিট পাথরের খাড়া দেয়াল। বোঝা গেলো, ক্রেসপো আইল্যাণ্ডের তলায় আসা গেছে।

ক্যাপ্টেন নেমো থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এটাই তাঁর রাজ্যের সীমা—তারপরেই প্রবলকঠিন ডাঙা। এবার ফিরে যেতে হয়। ফেরার সময় নেমো আমাদের অন্য পথে নিয়ে এলেন। বেশ খানিকটা চড়াই বেয়ে ওঠবার পর হঠাৎ একটি সামুদ্রিক শ্যাওলার ঝোপ লক্ষ্য ক'রে বন্দুক ছুঁড়লেন ক্যাপ্টেন নেমো। অমনি ছটফট করতে-করতে একটি সিন্ধু-ভোঁদড় ছিটকে পড়লো। লম্বায় প্রায় পাঁচফুট হবে এই সিন্ধু-ভোঁদড়, রুপোলি আর বাদামী রঙের চামড়াটা নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান হবে—বোধ করি সেই জন্যেই মরা ভোঁদড়টিকে নেমোর অনুচরটি কাঁধের উপর ঝুলিয়ে নিলে।

ক্রমে আবার বালির রাজ্যে চ'লে এলুম। জল এখানে এতই কম যে মাঝে-মাঝে আমাদের উল্টো-প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছিলো জলের উপরে। দূরে 'নটিলাস'-এর আলো ঝাপশাভাবে দেখা যাচ্ছে। 'নটিলাস'কে দেখে তাড়াতাড়ি এগোতে যাবো, অমনি এক ধাক্কায় নেমো আমাকে গুল্মরাশির উপরে ফেলে দিলেন। তাঁর সঙ্গীটিও কোনসাইলকে তেমনি জোর ক'রে ওই ঝোপের আড়ালে শুইয়ে দিলে। হঠাৎ এই আক্রমণের কারণ কী, তা বোঝবার আগেই দেখি ক্যাপ্টেন নেমোও মাথা নিচু ক'রে আমার পাশে শুয়ে পড়েছেন। তাঁর সঙ্গীটিও তা-ই করলে।

তারপরেই যা চোখে পড়লো তাতে আমার বুকের রক্ত ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো। দেখি দুটো প্রকাণ্ড আকৃতির হাঙর মাথার উপর দিয়ে মন্থর-ভাবে ভেসে যাচ্ছে। জলের এই নেকড়ে দুটির সামনের দিক থেকে ফসফরাসের দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো ব'লে চিনতে মোটেই অসুবিধে হয় না। হাঙর! স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো চোখ, বিকট মুখে সারি-সারি প্রবল-ভীষণ দাঁত, আর রুপোর মতো পেট নিচে থেকে স্পষ্ট দেখা গেলো। প্রায় ছুঁয়ে গেলো তারা আমাদের, তবু যে দেখতে পেলো না এটা আমাদেরও পরম সৌভাগ্য। না-হ'লে এই ভীষণ সিন্ধু-নেকড়ের

সঙ্গে যুদ্ধে কী ফলাফল হ'তো কে জানে।

আধ ঘণ্টা পরে 'নটিলাস'-এ পৌঁছোলুম। বাইরের ঢাকনাটা তখনো খোলা ; ভিতরে ঢোকার পর ঢাকনাটা বন্ধ ক'রে ক্যাপ্টেন নেমো একটা বোতাম টিপে দিলেন। আস্তে-আস্তে ঘরের জল নেমে গেলো।

ডুবুরি-পোশাক খুলে রেখে যখন নিজের কামরার দিকে এগোচ্ছি, তখন অবসাদে আমার সর্বাঙ্গ ভারি হ'য়ে এসেছে।

১০

সিন্ধুরোল

পরের দিন সকালে জেগে উঠতেই দেখি শরীরটা বেশ হালকা আর ঝরঝরে লাগছে। প্ল্যাটফর্মের উপরে গিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখলুম! স্বচ্ছ সুন্দর আবহাওয়া, দিগন্তে কোনো জাহাজের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। ফেনিল নীল জলের উপর সূর্যের আলো প'ড়ে ঝিকিয়ে উঠছে। শান্ত সমুদ্রের মধ্যে কোন অনন্ত ছন্দে ঢেউ উঠছে আর পড়ছে, খানিকক্ষণ পরেই যে-ছন্দ রক্তের মধ্যে নেশা ধরিয়ে দেয়।

সমুদ্রের এই নেশা-ধরানো ছন্দ যেন আমার বুকের মধ্যেই ঢেউ তুলে দিলে। সমুদ্রের এই অনন্ত কলরোল শুনছি কান পেতে, এমন সময় ক্যাপ্টেন নেমো এসে দেখা দিলেন। আমার উপস্থিতি তাঁর চোখেই পড়লো না। সমুদ্র পর্যবেক্ষণ ক'রে কী-এক দুর্বোধ ভাষায় তিনি কতগুলো নির্দেশ দিলেন।

ডেকের চারধারে আগের রাতে জাল পেতে রাখা ছিলো—সকালে তাতে অনেক মাছ ধরা পড়েছে। বিশজন নাবিক উঠে এসে সেগুলি তুলে নিতে লাগলো। এই নাবিকদের মধ্যে পৃথিবীর সব জাতের লোকই বোধ করি আছে। আইরিশ, ফরাশি, স্লাভ, গ্রীক—ইয়োরোপের প্রায় সব দেশের লোকই দেখতে পেলুম আমি। কিন্তু তারা সবাই কথা বলে

সেই দুর্বোধ বিদঘুটে ভাষায়, যার একবর্ণও আমি বুঝি না; আর তার ফলে এঁদের জাতিগত পরিচয়ও বুঝে-ওঠা মুশকিল। নাবিকরা কেউ আমাকে যেন লক্ষই করলে না, সবাই নিজেদের কাজেই ব্যস্ত হ'য়ে রইলো।

'নটিলাস' একটানা দক্ষিণ-পুব দিকে ছুটে চলেছে। পয়লা ডিসেম্বর আমরা বিষুবরেখা পেরিয়ে এলুম। মাঝে-মাঝে কেবল প্রশান্ত মহাসাগরের অরণ্যময় অজ্ঞাত দ্বীপ ছাড়া আর কোনো চেনাঅচেনার ভূখণ্ডই কখনো চোখে পড়ে না। সমুদ্র এখানে চোরা পাহাড়ে বিপজ্জনক। জলের তলায় কত জাহাজের ধ্বংসাবশেষ যে দেখা গেলো, তার সংখ্যা নেই। কামানে-বন্দুকে শ্যাওলা গজিয়েছে; জাহাজের কামরায় কাঁকড়ার রাজত্ব, পাটাতনের খোলে হাঙর ঘুরে বেড়ায়। দক্ষিণ সমুদ্রের রক্তলাল প্রবাল দ্বীপ পেরিয়ে আসার সময় দেখতে পেলুম অনেক বছর আগে ডুবে-যাওয়া বহু জাহাজের ধ্বংসাবশেষ। কাঠের খোল আর পাটাতন প'চে গিয়েছে, জীর্ণ ও নরম হ'য়ে আছে তারা। মাঝে-মাঝে ওই সব জাহাজের উদ্দেশ্যে 'নটিলাস'-এর বাহিনী বেরোয়; জীর্ণ জাহাজের মধ্য থেকে যাবতীয় মূল্যবান সম্পত্তি উদ্ধার ক'রে নিয়ে এসে জাহাজে তোলে।

শেষকালে প্রবাল সমুদ্রও পেরিয়ে গেলো 'নটিলাস'। আমার এখন আর ক্যাপ্টেন নেমোর সঙ্গে বেশি দেখা হয় না। মাঝে-মাঝে আসেন তিনি, অল্পক্ষণ কথাবার্তা হয়, তারপরেই আবার তিনি 'নটিলাস'-এর পরিচালনায় ব্যস্ত হ'য়ে চ'লে যান। একদিন ক্যাপ্টেন নেমোর কাছ থেকে শোনা গেলো, অস্ট্রেলিয়া আর নিউগিনির মধ্যকার টোরেজ প্রণালী দিয়ে আবার আমরা ভারত মহাসাগরে গিয়ে পড়বো। এখানে চোরা পাহাড়ের সংখ্যা এত বেশি যে যে-কোনো মুহূর্তে বিষম-কোনো দুর্ঘটনা ঘ'টে যেতে পারে। নিজের হাতে 'নটিলাস' চালাবার ভার নিলেন ক্যাপ্টেন নেমো। 'নটিলাস' জলের উপর ভেসে উঠলো। যেন তিনি ইন্দ্রজাল জানেন, এমনিভাবে ভোজবাজির মতো চোরা পাহাড়ের

বিপদসংকুল রন্ধ্রপথ দিয়ে অত বড়ো ডুবোজাহাজটিকে সন্তর্পণে পার ক'রে নিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। একটা দ্বীপের কাছ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ কিসের সঙ্গে যেন প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো, আমি ছিটকে প'ড়ে গেলুম ডেকের একপাশে।

আসলে চোরা পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েছিলো 'নটিলাস'; পাহাড়ের খাঁজে আটকে গিয়েছে ওই ধাকায়। এমনিতে কোনো বিপদ হয় নি, তবে পুরো ভরা-জোয়ারের সময় ছাড়া এই খাঁজ থেকে উদ্ধার পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। পাঁচদিন পরে পূর্ণিমা; তখন জোয়ারের জলে 'নটিলাস' ভেসে উঠবে। ততদিন এখানে অপেক্ষা করা ছাড়া আর-কোনো উপায় নেই।

ক্যাপ্টেন নেমোর সঙ্গে দেখা হ'লে জিগেস করেছিলুম, 'কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে বুঝি?'

'না, দুর্ঘটনা নয়, ঘটনা—'

'এমন ঘটনা যে আপনাকে তার ফলে ডাঙায় আশ্রয় নিতে হবে?'

অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন নেমো। তারপর আস্তে বললেন, ' "নটিলাস"কে আপনি এখনো চেনেন নি, প্রফেসর।'

তক্ষুনি আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তন ক'রে ফেললুম। 'নেড আর কোনসাইলের বড়ো ইচ্ছে এই ক-টা দিন জাহাজে না-থেকে সামনের দ্বীপটায় ঘুরে আসে। কত দিন ডাঙায় পা দেয় নি ওরা। আপনার কোনো আপত্তি আছে কি?'

আসলে প্রবল আপত্তিরই প্রত্যাশা করছিলুম আমি। কিন্তু আমাকে অবাক ক'রে দিয়ে ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, 'নিশ্চয়ই না। ইচ্ছে করলে আপনিও যেতে পারেন, মঁসিয় আরোনা।'

পরের দিন 'নটিলাস'-এর কুলুঙ্গি থেকে নৌকো নামানো হ'লো। আটটার সময় বন্দুকে-কুড়ুলে সজ্জিত হ'য়ে রওনা হলুম আমরা। নেড হাল ধ'রে বসলো, আমি আর কোনসাইল প্রাণপণে দাঁড় টানলুম।

নেড ল্যাণ্ডের ফুর্তির আর শেষ নেই। এতদিনে ওই জেলখানা থেকে সে মুক্তি পেয়েছে, আর-কোনোদিন সেখানে ফিরে যাবার মতলব তার নেই।

জিলবোয়া দ্বীপের বালিতে 'নটিলাস'-এর নৌকো গিয়ে যখন ঠেকলো, তখন সাড়ে-আটটা বাজে।

১১

জিলবোয়ার জংলিরা

সত্যি বলতে, ডাঙায় পা দেবার সঙ্গে-সঙ্গে কেমন অদ্ভুত একটা মুক্তির আনন্দ ছড়িয়ে পড়লো আমার মধ্যে। আসলে 'নটিলাস'-এ যে কখনো কষ্টে ছিলুম তা নয়—বরং কোনো রকম অস্বাচ্ছন্দ্যেরই অবকাশ ছিলো না সেখানে। যখনই যা চাই, তৎক্ষণাৎ তা হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। এমনকি ক্যাপ্টেন নেমোর বিরাট গ্রন্থাগারে আমার পড়াশোনার কোনো অসুবিধে হ'তো না। উপরন্তু 'নটিলাস'-এর কাচের জানলা দিয়ে এই আশ্চর্য সিন্ধুতলের অভিজ্ঞতা হয়েছিলো আমার, পৃথিবীর অন্য-কোনো বিজ্ঞান-সাধকের যে-সৌভাগ্য হয় নি। কিন্তু সব সত্ত্বেও শক্ত মাটিতে পা দেয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝতে পারছিলুম আসলে আমরা ডাঙারই জীব —সম্পূর্ণভাবে পারিপার্শ্বিকের ক্রীতদাস। অথচ আমরা মাত্র দু-মাস ধ'রে 'নটিলাস'-এর যাত্রী হিশেবে সিন্ধুতলে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আমাদের অভিযান তাই আনন্দে ও উৎসাহে ভ'রে গেলো। নেডের ফুর্তি আর উৎসাহের তো আর শেষ নেই। তার নাকি মাছ খেয়ে-খেয়ে অরুচি ধ'রে গেছে; ডাঙার জগতের পশুপক্ষীর মাংস ভক্ষণ না-করা অবধি তার মুখে নাকি আর-কখনোই রুচি ফিরবে না। তাই টো-টো ক'রে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ালুম আমরা শিকারের উদ্দেশ্যে। রাত্রে সমুদ্রের তীরে ব'সে মাংস পুড়িয়ে আর চেনা-অচেনা সুস্বাদু ফলে

আমাদের নৈশভোজ সাঙ্গ হ'লো। কাছেই আমাদের নৌকো বাঁধা; একটু দূরে 'নটিলাস' কোনো মস্ত পাথরের মতো সমুদ্রের উপর স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

নেড ল্যাণ্ডের প্রচণ্ড ফুর্তি আমাদের নৈশভোজকে আরো চঞ্চল ও আনন্দময় ক'রে তুললো। তার তৃপ্তি এইখানেই সবচেয়ে বেশি যে ' "নটিলাস"-এর নরাধমেরা' কিছুতেই এই উপাদেয় খাদ্যের আস্বাদ পাচ্ছে না।

দ্বিতীয় দিনও সন্ধ্যার পরে দ্বীপের উপকূলে আমাদের নৈশভোজ সাঙ্গ হ'লো। আর খেতে-খেতে এই প্রথম আমি কোনসাইলের মুখে তার গোপন ইচ্ছার প্রকাশ শুনতে পেলুম, 'আহা! আজ সন্ধ্যায় যদি ওই "নটিলাস"-এ ফিরতে না-হ'তো!'

'যদি কোনোদিনই না-ফিরি', নেড ল্যাণ্ড যোগ ক'রে দিলে। কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই আচম্বিতে আমাদের পায়ের কাছে একটা মস্ত পাথর এসে পড়লো।

সচমকে জঙ্গলের দিকে তাকালুম আমরা।

'আকাশ থেকে তো আর পাথর পড়ে না', কোনসাইল বললে, 'অন্তত উল্কা না-হ'লে।' ব'লে কোনসাইল তার হাতের পায়রার ঠ্যাংটায় কামড় বসাতে যাবে, এমন সময় দ্বিতীয় আরেকটা পাথর এসে পড়ল— পড়লো ঠিক তার হাতেই, এবং পায়রার ঠ্যাংটা তার হাত থেকে খ'শে প'ড়ে গেলো।

তিনজনেই উঠে দাঁড়িয়ে বন্দুক তুলে ধরলুম; কেউ কোনো আক্রমণ করলে তাকে সমুচিত উত্তর দিতে হবে।

'বাঁদরের কাণ্ড নয় তো?' নেড ল্যাণ্ড জিগেস করলো।

'বনমানুষই বটে,' কোনসাইল বললে, 'তবে তাদের জংলি বলা হয়।'

'নৌকোয়—শিগগির নৌকোয় চলো।' ব'লেই দৌড়োতে লাগলুম আমি। এ-সব দ্বীপে যে চতুষ্পদ শ্বাপদের চেয়ে দ্বিপদ নরখাদকের ভয়ই

বেশি, তা আমার জানা ছিলো।

তৎক্ষণাৎ গাছপালার আড়াল থেকে তীরধনুক নিয়ে জনাকুড়ি জংলির আবির্ভাব ঘটলো। আমরা যেখানে বসে নৈশ ভোজ সারছিলুম, নৌকোটা সেখান থেকে প্রায় ষাট ফিট দূরে বাঁধা ছিলো। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলুম আমরা নৌকো লক্ষ্য ক'রে। নেড কিন্তু এই বিষম বিপদের মধ্যেও তার ফলমূল আর মাংসের সংগ্রহ আনতে ভুললো না। আরো কয়েকটা ঢিল এসে পড়লো আশেপাশে। ঝপাঝপ ক'রে দাঁড় টেনে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা 'নটিলাস'-এ পৌঁছে গেলুম।

'নটিলাস'-এ পৌঁছেই আমি সেলুনের দিকে ছুটলুম। কারণ অর্গ্যানের প্রবল-গম্ভীর সুর থেকে বোঝা যাচ্ছিলো যে ক্যাপ্টেন নেমো সেলুনে ব'সে অর্গ্যান বাজাচ্ছেন।

'ক্যাপ্টেন,' উত্তেজিতভাবে ডাক দিলুম আমি।

সুরের মধ্যে ডুবে আছেন যেন তিনি, আমার কথা তাঁর কানেই পৌঁছোলো না। তাঁর হাত ধ'রে আবারও আমি বললুম, 'ক্যাপ্টেন নেমো!'

যেন ছন্দ কেটে গেলো; কেঁপে উঠে ফিরে তাকালেন নেমো। 'ও, আপনি! তা শিকার কেমন লাগলো? উদ্ভিদবিদ্যার কোনো নতুন তথ্য যোগাড় হ'লো?'

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা একদল দ্বিপদকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি, বংশপরম্পরায় যাদের বেশ বিপজ্জনক ব'লে খ্যাতি আছে।'

'তা সেই দ্বিপদগুলো কী?'

'জংলি!'

'জংলি?' ক্যাপ্টেন নেমোর কণ্ঠস্বর ব্যঙ্গে ভ'রে গেলো, 'পৃথিবীর এক জায়গায় পা দিয়ে বর্বর জংলি দেখে আপনি অবাক হচ্ছেন, প্রফেসর? একটা জায়গার নাম করুন তো যেখানে বর্বরদের বাস নেই? আর তাছাড়া আপনি যাদের বর্বর জংলি বলেন তারা কি অন্য-কারো চেয়ে

কোনো অংশে নিকৃষ্ট ?'

'কিন্তু ক্যাপ্টেন—'

'জংলিরা কোথায় নেই, প্রফেসর ? আমার কথা যদি ধরেন, ম'সিয়, তো জানাই : আমি এই বর্বরদের পৃথিবীর সর্বত্র দেখেছি।'

'তা আপনি যদি "নটিলাস"-এর মধ্যে তাদের না-দেখতে চান তো আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়।'

'সে-সম্বন্ধে আপনাকে ভাবতে হবে না, প্রফেসর। এতে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই।'

'কিন্তু ওরা যে সংখ্যায় অগুন্তি।'

'কতজনকে দেখেছেন আপনি ?'

'অন্তত একশো তো হবেই।'

'ম'সিয় আরোনা,' ক্যাপ্টেন নেমো আবার অর্গ্যানের চাবিতে হাত দিলেন, 'যদি পাপুয়ার সমস্ত বর্বর এসে চড়াও হয় তবু "নটিলাস"-এর গায়ে একটা আঁচড় কাটার ক্ষমতা কারো নেই,' ব'লেই আমার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে আবার তিনি অর্গ্যানের উপর ঝুঁকে পড়লেন।

পরের দিন কাতারে-কাতারে পাপুয়ার জংলিরা চারপাশ থেকে 'নটিলাস'কে ঘিরে ধরলে, কিন্তু জাহাজের উপরে উঠতে বা জাহাজের খুব কাছে আসতে তাদের কারো সাহসে কুলোলো না। সারাদিন তারা তীরে ভিড় ক'রে রইলো ; রাতে তীরে-জ্ব'লে-ওঠা অজস্র অগ্নিকুণ্ড দেখেও বোঝা গেলো অচিরে 'নটিলাস'-এর সঙ্গ ত্যাগ করার মতলব তাদের নেই।

তার পরের দিন ডেকের উপর উঠতেই দেখা গেলো গোটাকুড়ি ফাঁপা গাছের ক্যানো জলে ভাসিয়ে বিস্তর পাপুয়া যোদ্ধা 'নটিলাস' লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে আসছে। আমাকে আর কোনসাইলকে দেখেই তারা চ্যাচেমেচি ক'রে উঠলো। তার পরেই আমাদের আশপাশে এক ঝাঁক তীর এসে পড়লো।

এবারে তাহ'লে সত্যি তারা আক্রমণ করার জন্য উৎসুক। অথচ

জোয়ার না-এলে একচুলও নড়ানো যাবে না 'নটিলাস'কে। তাহ'লে আর রক্ষে নেই। হন্তদন্ত হ'য়ে নিচে গিয়ে ক্যাপ্টেন নেমোকে খবর দিলুম। নেমো কিন্তু আদৌ কিছুমাত্র বিচলিত না-হ'য়ে 'নটিলাস'-এর বহির্দ্বার বন্ধ ক'রে দেবার আদেশ দিলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'মিথ্যেই আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন, প্রফেসর। আপনাদের যুদ্ধ-জাহাজের কামানের গোলাই যদি "নটিলাস"-এর গায়ে আঁচড়টি কাটতে না-পারে, তাহ'লে কয়েকশো পাপুয়াই বা তীর-ধনুক নিয়ে কী করবে, বলুন?'

'কিন্তু ক্যাপ্টেন, কাল বাতাস নেবার জন্য আপনাকে তো "নটিলাস"-এর ঢাকনি বা বহির্দ্বার খুলতেই হবে—তখন যে জংলিরা ভিতরে ঢুকে পড়বে।'

'মঁসিয় আরোনা,' ঠাণ্ডা গলায় বললেন ক্যাপ্টেন নেমো, 'বহির্দ্বার খোলা থাকলেও কি "নটিলাস"-এর ভিতরে ঢোকা এতই সহজ? আপনি কিছুমাত্র বিচলিত হবেন না।…হ্যাঁ, ভালো কথা। "নটিলাস" কিন্তু কাল দুটো চল্লিশের সময় জোয়ারের জলে ভেসে উঠবে।' জংলিদের প্রসঙ্গে আর কোনো কথাই বললেন না ক্যাপ্টেন নেমো। এই ক-দিন এই অদ্ভুত মানুষটিকে যতটুকু চিনেছিলুম, তাতে আমিও আর-কোনো উচ্চবাচ্য না-ক'রে নিজের ঘরে ফিরে এলুম।

ফিরে এলুম বটে, কিন্তু সে-রাতে জংলিদের উৎপাতে ভালো ক'রে ঘুমোনো গেলো না। সারা রাত তারা 'নটিলাস'-এর উপর উন্মাদের মতো দাপাদাপি করলে, আর থেকে-থেকে রক্ত-জল-করা রণহুংকার দিলে।

পরের দিন বেলা যখন দুটো পঁয়ত্রিশ, ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে ডেকে ওঠার সিঁড়ির কাছে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি নেড আর কোনসাইলও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যাপ্টেন নেমোর নির্দেশ মতো একটি নাবিক বহির্দ্বারটি খুলে দিলে।

তৎক্ষণাৎ বিকট উল্কি-কাটা একটি বিশ্রী মুখ দেখা গেলো ফোকর

দিয়ে ; পরমুহূর্তে সে সিঁড়ির রেলিঙে হাত রাখলে নিচে নামবে ব'লে ; আর পরক্ষণেই কানফাটা আর্ত চীৎকারে জংলিটা লাফিয়ে উঠলো। আরো কয়েকটি জংলি কৌতূহলভরে রেলিঙে হাত দিতেই তাদেরও ওই একই ভাবে চীৎকার ক'রে লাফিয়ে উঠতে হ'লো। তিড়িং-তিড়িং ক'রে লাফিয়ে ওরা গিয়ে নামতে থাকলো ক্যানোয়। ডেকের উপর একটা দারুণ হট্টগোল শুরু হ'য়ে গেলো। ব্যাপার দেখে কোনসাইল তো হেসেই লুটোপাটি !

কী ব্যাপার বুঝতে না-পেরে আমি হতভম্ব হ'য়ে তাকিয়ে রইলুম। নেডের আবার কৌতূহল আর বুকের পাটা দুটোই কিঞ্চিৎ বেশি, তাই সেও সিঁড়ির রেলিঙে হাত রেখে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করলে। সঙ্গে-সঙ্গে সেও বিকট চীৎকার ক'রে আমাদের দিকে ছিটকে এলো।

'বিদ্যুৎ ! বিদ্যুৎ ! বাজ পড়েছে আমার উপর !'

নেডের চ্যাঁচানি শুনেই সমস্ত রহস্যটা আমার কাছে পরিষ্কার হ'য়ে গেলো। ক্যাপ্টেন নেমো রেলিঙের মধ্যে বিদ্যুৎ চার্জ ক'রে দিয়েছেন— এমন মাত্রায় দিয়েছেন যে প্রবল ধাক্কা লাগবে কেবল, তাছাড়া আর-কোনো ক্ষতিই হবে না ; কিন্তু তাতেই মন্ত্রের মতো কাজ হ'লো। সমস্ত ব্যাপারটাকে ভৌতিক বা অপার্থিব ভেবে উন্মাদের মতো পাপুয়ারা পালাতে লাগলো, দেখতে-দেখতে তাদের চীৎকার দূরে মিলিয়ে গেলো।

ইতিমধ্যে জোয়ারের জলে 'নটিলাস' ভেসে উঠেছিলো। ঠিক দুটো চল্লিশের সময় ইঞ্জিন জেগে উঠলো সশব্দে, শুরু হ'লো চাকার আন্দোলন ; ধীরে-ধীরে সেই ভয়ানক টোরেজ প্রণালীকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলো 'নটিলাস'।

১২

ভয়ংকরের গান

পরের দিন সকাল বেলা 'নটিলাস'-এর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দেখি ফার্স্ট অফিসার সমুদ্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ক'রে যথোচিত নির্দেশ দিচ্ছেন। 'নটিলাস' তখন ১০৫° দ্রাঘিমা আর ১৫° দক্ষিণ অক্ষরেখায় প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে—সম্ভবত এই ক-দিন টোরেজ প্রণালীতে আটকে থাকতে হয়েছে ব'লেই এত জোরে সে যাচ্ছে।

আমি প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াবার পরক্ষণেই ক্যাপ্টেন নেমোও সেখানে এসে দাঁড়ালেন, তারপর দুরবিন দিয়ে কিছুক্ষণ দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পাথরের মূর্তির মতো কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন নেমো, তারপর দুরবিন নামিয়ে কী এক দুর্বোধ ভাষায় ফার্স্ট অফিসারকে কয়েকটি কথা বললেন তিনি ; ফার্স্ট অফিসারকে অত্যন্ত অস্থির ও উত্তেজিত দেখালো, কিন্তু ক্যাপ্টেন নেমোর শান্ত ও সংযত মূর্তি দেখে কোনো কিছুই বোঝবার জো ছিলো না। আমার দিকে দৃকপাত পর্যন্ত না ক'রে কিছুক্ষণ ইতস্তত পায়চারি করলেন ক্যাপ্টেন, মাঝে-মাঝে কেবল একটু থেকে-থেকে দিগন্তের সেই বিশেষ দিকটাতে তাকাতে লাগলেন। ফার্স্ট অফিসারও তাঁর দুরবিন দিয়ে বারে-বারে সেই দিকে তাকাচ্ছিলেন। কিন্তু আমি সেদিকে তাকিয়ে কিছুই আবিষ্কার করতে পারলুম না। সূর্য আর সমুদ্রের মিলনমন্দিরে কিছুই দেখা গেলো না। এই বিশাল সমুদ্রের মধ্যে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে কী দেখতে পেয়েছেন তাঁরা ? হঠাৎ ক্যাপ্টেন নেমো ফার্স্ট অফিসারকে কী একটা নির্দেশ দিতেই 'নটিলাস'-এর গতি আরো বেড়ে উঠলো।

আমার আর এই রহস্য ভালো লাগলো না। অধীরভাবে সেলুনে

ফিরে গিয়ে একটা দুরবিন নিয়ে চোখে দিলুম। কিন্তু কিছু নিরীক্ষণ করার আগেই এক হ্যাঁচকা টানে তা হাত থেকে খ'শে পড়লো।

পিছন ফিরে তাকিয়ে যাঁকে দেখলুম তিনি ক্যাপ্টেন নেমো হ'লেও তাঁকে আমি চিনি না। সম্পূর্ণ বদলে গেছেন তিনি। কোঁচকানো ভুরুর তলায় চোখের তারা দপদপ ক'রে জ্বলছে ; দৃঢ় বিভক্ত ঠোঁটের ভিতর দাঁতে দাঁত চেপে আছেন তিনি ; কেমন যেন শক্ত হ'য়ে গেছে তাঁর শরীর ; কঠিন হ'য়ে উঠেছে মুখচ্ছবি, আর তাঁর আস্ত প্রতিচ্ছবি থেকে কী-এক প্রচণ্ড ঘৃণা ফুটে বেরোচ্ছে।

তাহ'লে কি না-জেনে এমন-কোনো অপরাধ করেছি যাতে রোষে তাঁর সমগ্র মূর্তি এমন বদলে গেছে ? কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলুম তাঁর রোষ ও ঘৃণার উৎস আমি নই, কারণ কঠিনভাবে তখনও তিনি দিগন্তের সেই বিশেষ কোণটিরই দিকে তাকিয়ে আছেন। ফার্স্ট অফিসারকে কোনো বিদেশী ভাষায় অল্প কয়েকটি কথায় নির্দেশ দিতে দিতে নিজেকে তিনি সামলে নিলেন।

'মঁসিয় আরোনা, "নটিলাস"-এ আশ্রয় দেবার সময় আপনাদের যে-শর্ত দিয়েছিলুম, তা মান্য করার সময় এসেছে এখন।'

'কী বলতে চাচ্ছেন, তা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আপনাদের তিনজনকেই একটি ঘরে বন্দী ক'রে রাখা হবে। পরে অবিশ্যি আবার যথাসময়ে চলাফেরার স্বাধীনতা ফিরে পাবেন।'

'আপনি "নটিলাস"-এর সর্বময় কর্তা, কাজেই আপনি যা বলবেন তা-ই হবে। কিন্তু একটা কথা আমি জিগেস করবো ?'

'না, মঁসিয়, একটাও না।'

এ-কথার পর তাঁর নির্দেশ মান্য করা ছাড়া আর-কিছুই করার রইলো না। নিচে আসতেই চারজন নাবিক আমাদের তিনজনকে নিয়ে গেলো সেই ঘরটিতে, যেখানে সর্বপ্রথম আমাদের বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিল। টেবিলের উপর ছোটহাজরি সাজানো হয়েছিলো। নেড গোড়ায় খুব খানিকটা চোটপাট ক'রে তাই খেতে শুরু ক'রে দিলে।

যদিও আমি সাত-পাঁচ নানা কথা ভাবছিলুম, তবু আমিও দেরি না-ক'রে হাত লাগালুম। কোনসাইলও কোনো বাক্য ব্যয় না-ক'রে দক্ষিণ হস্তের ব্যবহারে তন্ময় হ'য়ে পড়লো। খাওয়া শেষ হবার পরেই নেড আর কোনসাইল দিব্যি শুয়ে প'ড়ে ঘুম লাগালে। হঠাৎ এমন অসময়ে ওদের ঘুমিয়ে পড়ার কোনো কারণ বুঝলুম না। আমারও বেজায় ঘুম পাচ্ছিলো। চোখের পাতায় কে যেন আঠা মাখিয়ে দিয়েছে, কিছুতেই চোখ খুলে রাখতে পারছি না। সেই আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যে চকিতে একটা কথা মাথার মধ্যে খেলে গেলো। বুঝতে পারলুম যে ক্যাপ্টেন খাবারের মধ্যে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছেন। 'নটিলাস' তখন আর দুলছিলো না, সম্ভবত জলের তলায় ডুব দিয়েছে। তারপব আর কিছু মনে নেই।

পরের দিন ঘুম ভাঙলে কিন্তু আশ্চর্য ঝরঝরে লাগলো নিজেকে। তাড়াতাড়ি উঠে ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেলো। তাহ'লে এখন আমি স্বাধীন। তাহ'লে আমার চলাফেরার এখন আর কোনো বাধা-নিষেধ নেই।

করিডরে বেরিয়ে প্ল্যাটফর্মে যাবার দরজা খোলা দেখে সোজা সেখানে গিয়ে হাজির হলুম। নেড আর কোনসাইলও সেখানে ছিলো তখন। সমুদ্র তেমনি শান্ত-নীল, আকাশ ফেটে শাদা রোদ চুঁইয়ে পড়ছে, কোনো উপদ্রব বা কিছুরই কোনো চিহ্ন নেই। আর এই শান্ত সমুদ্রের মধ্যেই 'নটিলাস' ভেসে যাচ্ছে তার সমস্ত গোপন রহস্য সমেত। নিচে নেমে এলুম। 'নটিলাস'ও জলের তলায় ডুব দিলে। খানিক পরেই আবার ভেসে উঠলো। কয়েকবার এমনি ওঠা-নামা করলো ডুবো-জাহাজ—যেন কোনো কারণে বড্ড অশান্ত, বড্ড অস্থির হ'য়ে পড়েছে সে।

বেলা তখন দুটো হবে, আমি সেলুনে ব'সে আমার দিনলিপি লিখছি, এমন সময় ক্যাপ্টেন নেমো এসে ঢুকলেন। আমার শুভেচ্ছার উত্তরে সামান্য মাথা নুইয়ে চুপ ক'রে অভিবাদন জানালেন, কোনো

কথাই বললেন না। তাঁর সমস্ত শরীরে ক্লান্তির ছাপ, চোখ দুটি রক্তবর্ণ—সারা রাতে বোধ হয় এক কোঁটাও ঘুম হয় নি। অস্থিরভাবে খানিকক্ষণ পায়চারি করলেন তিনি ঘরের মধ্যে। দু-চারটে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, কিন্তু এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো যে যন্ত্রপাতির দিকে মোটেই তাঁর মন নেই। যেন কী একটা বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করছেন, কিন্তু কিছুতেই আর মনস্থির করতে পারছেন না। শেষ কালে হঠাৎ আমার সামনে এসে সোজাসুজি জিগেস করলেন, 'মঁসিয় আরোনো, আপনি কি কখনো ডাক্তারি করেছেন?'

প্রশ্নটা এমনি আকস্মিক যে প্রথমটায় আমি অবাক হ'য়ে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলুম।

ক্যাপ্টেন নেমো আবার জিগেস করলেন, 'আপনি কি ডাক্তারি জানেন? আমি এটা জানি যে আপনার কয়েকজন সহকর্মী চিকিৎসা-বিদ্যালয় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন—কিন্তু আপনি?'

'আমিও আসলে ডাক্তার ছিলুম। পারী বিচিত্রাভবনে যোগ দেবার আগে আমি ডাক্তারি করতুম।'

তাহ'লে আমার একজন লোককে আপনি একটু পরীক্ষা ক'রে দেখবেন কি?'

'কেন দেখবো না? তার কি খুব অসুখ করেছে হঠাৎ।'

কোনো কথা না-ব'লে ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে সঙ্গে ক'রে একটা ছোটো কামরায় নিয়ে গেলেন। লোকটি যে মুমূর্ষু, তা বুঝতে এক মুহূর্তও দেরি হ'লো না। কী একটা ভোঁতা হাতিয়ারের মারাত্মক আঘাতে তার মাথার খুলি চৌচির হ'য়ে মগজটা বেরিয়ে এসেছে। রক্তমাখা পট্টিটা খোলার সময় টু-শব্দটি পর্যন্ত করলে না সে, শুধু ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। মুখ দেখে মনে হ'লো লোকটা বোধ হয় আসলে ইংরেজ।

দেখার কিছুই ছিলো না বস্তুত। এর মধ্যেই মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিলো তার সর্বাঙ্গে—হাত-পা ঠাণ্ডা হ'তে শুরু করছিলো।

'এমন মারাত্মক চোট ও পেলে কোথেকে?' ক্যাপ্টেন নেমোকে আমি জিগেস করলুম।

'তা শুনে আপনার কী হবে? হঠাৎ একটা দারুণ ঝাঁকুনিতে ইঞ্জিনের একটা কীলক ভেঙে যায়—লাফিয়ে গিয়ে চোটটা সম্পূর্ণ নিজের মাথায় নিয়ে ও ওর সঙ্গীকে বাঁচিয়ে দেয়। কিন্তু অবস্থা কী-রকম দেখলেন, বলুন? আপনি নিঃসংকোচে বলতে পারেন—কারণ ও ফরাশি জানে না।'

'বলার কিছুই নেই। বেশি হ'লে বোধকরি আর মাত্র ঘণ্টা-দুই ওর পরমায়ু।'

'কিছুতেই কি ওকে আর বাঁচানো যায় না?'

'না, কিছুতেই না।'

ক্যাপ্টেন নেমোর হাত দুটি হঠাৎ কী এক প্রচণ্ড আবেগে মুঠি হ'য়ে গেলো। তারপরেই তাঁর চোখ ফেটে বেরিয়ে এলো জলের ধারা।

কী ক'রে মানুষের দেহে প্রাণের স্ফুলিঙ্গ নিভে আসে, আরো-কিছুক্ষণ তা-ই দেখে আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলুম।

সে-রাত্রে আমার আর ভালো ঘুম হ'লো না। সারা রাত ধ'রে ক্যাপ্টেন নেমোর চঞ্চল ও স্পর্শাতুর আঙুলের তলায় গম্ভীর অর্গ্যান কেঁদে উঠলো। মানুষের কোনো আবেগ যেখানে পায়ে হেঁটে যেতে পারে না, সেখানে এই বিষণ্ণ, মর্মন্তুদ, চাপা কান্নার মতো সংগীত যেন কোনো একা পাখির মতো বারে-বারে পাখা ঝাপটে পৌঁছোতে চাচ্ছে।

পরের দিন সকালবেলায় সমুদ্রের অনেক নিচে নিঃশব্দ এক শোক-যাত্রা বেরোলো একটি কফিন কাঁধে। প্রবালস্তূপে অন্ত্যেষ্টি হ'লো লোকটির, আর লাল ফুলের মতো প্রবাল ছড়িয়ে রইলো তার কবরের উপর। সেই স্তব্ধ শোকাতুর শেষ যাত্রার সঙ্গী ছিলুম আমিও। ফিরে আসার পর ক্যাপ্টেন নেমোকে বলেছিলুম, 'সত্যি হাঙরের খপ্পর থেকে অনেক দূরে আপনাদের এই কবরখানা—'

'হ্যাঁ ভাই,' গম্ভীরভাবে বললেন ক্যাপ্টেন নেমো, 'শুধু ডাঙার নয়, মানুষেরও কাছ থেকেও অনেক দূরে।'

১৩

সিন্ধুতলে মুক্তো কুড়ুনো

এই রহস্যময় মানুষটির কথা যত ভাবি, তত মনে হয়, এঁকে ছুঁতে পারি এমন সাধ্য আমার নেই। কে ইনি? কোন দেশের মানুষ? কোন গভীর ক্ষত তিনি লুকিয়ে রেখেছেন বুকের ভিতর? কেন সমস্ত মনুষ্য-সমাজের প্রতি তাঁর বিরাগ আর বিতৃষ্ণা এমন প্রবল?* অথচ তাঁর বুকের মধ্যে যে ভালোবাসার এক অফুরন্ত প্রস্রবণ আছে তা তো কাল সারা রাত অর্গ্যানের অফুরন্ত কান্নায় উপচে উঠছিলো! কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, বিদ্রোহী, যোদ্ধা—কোমলে ও কঠোরে তুলনাহীন এই মানুষটিকে কোনোদিনই আমি বুঝতে পারবো ব'লে মনে হয় না। আর তাই আমাদের মাপকাঠিতে তাঁকে বিচার করবার কথাও আমি ভাবতে পারি না।

পরের দিন ভোরবেলায় একটি পরিচারক এসে আমাকে ক্যাপ্টেন নেমোর কাছে ডেকে নিয়ে গেলো। সমুদ্রের নিচে মুক্তোর খেত দেখতে যেতে ইচ্ছুক কি না, তিনি জিগেস করলেন। দেখে কে বলবে এই মানুষটিই কাল অমন আর্ত ও ব্যথিত হ'য়ে উঠেছিলেন।

নেড আর কোনসাইল তো এই লোভনীয় প্রস্তাব শুনেই আনন্দে নৃত্য ক'রে উঠলো। সেই ডুবুরি-পোশাক প'রে শুধু ছুরি সম্বল ক'রে শুরু হ'লো আমাদের অভিযান। নেড কিন্তু কিছুতেই হারপুন না-নিয়ে যেতে রাজী হ'লো না। হারপুন ছাড়া জলের প্রাণীদের মুখোমুখি দাঁড়াতে

---

* এ-সব প্রশ্নের উত্তর জুল ভের্ন-এর বিখ্যাত উপন্যাস 'মিস্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড'-এ দেওয়া হয়েছে, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদে বাংলায় এই সুবৃহৎ উপন্যাসটি সহজলভ্য।

সে নাকি কিছুতেই রাজী নয়।

ভারত মহাসাগরের এই অঞ্চলে এমন অনেক সামুদ্রিক জীব দেখা গেলো, যাদের কোনো দিন এভাবে দেখতে পাবো ব'লেও কল্পনা করি নি। তার মধ্যে মস্ত ও ভীষণ একটি কাঁকড়াকে দেখে যে-ভয় পেয়েছিলুম, তাও কোনো দিন ভুলবো না।

সমুদ্রতলের মতো রোমাঞ্চকর জায়গা আর নেই। পাহাড় গম্ভীর, বিস্ময়কর, অচঞ্চল—কিন্তু সমুদ্র যেন পৃথিবীর অশান্ত হৃৎপিণ্ড—কোন-এক অধীর আবেগে প্রতি মুহূর্তেই চঞ্চল হ'য়ে আছে। কোন-এক রহস্যময় ভাষায় সে যেন সবসময়েই কী বলতে চাচ্ছে অসীমকে।

অনেকক্ষণ হাঁটার পর মুক্তো খেতে গিয়ে পৌঁছোলুম। খেতই বটে। যেখানে-সেখানে ঝিনুক প'ড়ে আছে; বাদামি তন্তুর বাঁধনে বন্দী তারা—বন্দী, মৃত, ব্যাধিগ্রস্ত। কোন-এক অদ্ভুত রোগে যখন তাদের দেহ থেকে ক্ষরণ হ'তে থাকে অবিরাম, তখন তা-ই জ'মে-জ'মে ক্রমে এই অমূল্য সিন্ধু-রূপান্তর ঘটিয়ে দেয়: শুক্তির মধ্যে কোনো অধীর অশ্রুর মতো ঝকমক ক'রে ওঠে মুক্তোর দানা। কত যে ঝিনুক প'ড়ে আছে তার কোনো সীমাসংখ্যা নেই। নেড তো দু-হাতে লুঠ করতে লাগলো—দেখতে-দেখতে তার থলি বোঝাই হ'য়ে গেলো।

ক্যাপ্টেন নেমো তারপরে আমাদের পথ দেখিয়ে মস্ত একটা গুহায় নিয়ে গেলেন। সিন্ধুতলের এই গুহার খোঁজ যে তিনি ছাড়া আর-কেউ রাখে না তা স্পষ্ট বোঝা গেলো। বড়ো-বড়ো থামের উপর গুহার ছাদটা দাঁড়িয়ে আছে, আর আশপাশে সমুদ্রের জীবরা যেন অনধিকার প্রবেশে ক্ষুব্ধ হ'য়ে অদ্ভুতভাবে লক্ষ ক'রে যাচ্ছে আমাদের। এক জায়গায় এসে ক্যাপ্টেন নেমো থেমে প'ড়ে আঙুল বাড়িয়ে যা দেখালেন তাতে দস্তুর-মতো তাজ্জব হ'য়ে গেলুম।

গুহাটা সেখানে কুয়োর মতো গভীর হ'য়ে গেছে, আর তারই একেবারে তলায় প'ড়ে আছে বিশাল একটি শুক্তি। এত বড়ো ঝিনুক আমি এমনকি 'নটিলাস'-এর সংগ্রহশালাতেও দেখি নি। স্থির শান্ত জলে কত

বছর ধ'রে যে এই ঝিনুকটি বেড়ে উঠেছে তা কে জানে—ক্যাপ্টেন নেমো যে এই বিশেষ ঝিনুকটির কথা আগে থেকেই জানতেন, তা তক্ষুনি বোঝা গেলো। ঝিনুকের বিশাল ডালা দুটি বন্ধ হ'য়ে আসছিলো, কিন্তু চকিতে ক্যাপ্টেন নেমো তাঁর ছোরাটা তার ফাঁকে রাখতেই ডালা দুটি আর পুরোপুরি বন্ধ হ'তে পারলো না। আর সেই ফাঁকের মধ্য দিয়ে ভিতরের জিনিশটি দেখেই আমি হতবাক হ'য়ে গেলুম।

মুক্তো যে কোনো নারকোলের মতো এত বড়ো হ'তে পারে, তা আমি নিজের চোখে না-দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না। 'নটিলাস'-এর সিন্দুকেও এত বড়ো মুক্তো আমি দেখি নি। আমি হাত বাড়াতে যেতেই নেমো বাধা দিয়ে ছোরাটা টেনে নিলেন, অমনি ঝিনুকের ডালা দুটি বন্ধ হ'য়ে গেলো। বছরের পর বছর ধ'রে এই গোপন গুহায় এইভাবেই বড়ো হ'য়ে চলবে মুক্তোটা, তারপর একদিন ক্যাপ্টেন নেমো তা সংগ্রহ ক'রে এনে তাঁর বিচিত্রাভবনে সাজিয়ে রাখবেন।

সেই গুহা থেকে বেরিয়ে এসে অনির্দিষ্টভাবে এদিক ওদিক ঘুরছি, হঠাৎ ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে টান দিয়ে একটা পাহাড়ের আড়ালে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

একটু দূরেই জলের মধ্যে চলমান একটি ছায়ামূর্তি দেখে তার কারণ বোঝা গেলো। হাঙর, না ওই জাতীয় কোনো হিংস্র সিন্ধুপ্রাণী? না, কিছুই নয়। আসলে সে সিংহলের একটি মুক্তো-ডুবুরি, জলের উপরে তার ছোট্ট ডিঙি নৌকো ভাসছে। লোকটা একেকবার নিচে নেমে দ্রুত হাতে ঝুলিভর্তি ক'রে মুক্তো তুলছে, তারপর চট ক'রে উপরে উঠে যাচ্ছে; পরক্ষণেই আবার নতুন ঝুলি নিয়ে আসছে।

হঠাৎ লোকটা যেন কোনো দারুণ ভয়ে আঁৎকে উঠলো। পরক্ষণেই তার মাথার উপরে ভেসে এলো মস্ত একটা রুপোলি ছায়া—হাঙরের পেট। হাঙরের উন্মুক্ত দাঁতের সারি আর ক্রূর নিষ্ঠুর চোখ দেখেই সে বুঝতে পারলে কেন তাকে সিন্ধুনেকড়ে বলে। প্রথম আক্রমণটা লোকটা কৌশলে এড়িয়ে গেলো বটে, কিন্তু পরের বারেই হাঙরটির ল্যাজের

ঝাপটে সে উল্টে প'ড়ে গেলো নিচে। অমনি হাঙরটা তীব্রবেগে ঘুরে নিচে নেমে এলো—এই বুঝি তার ওই চোখা লোভী নিষ্ঠুর দাঁতের ক'াকে লোকটা টুকরো-টুকরো হ'য়ে যায়!

এক লাফে সামনে এগিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন নেমো। হঠাৎ নতুন শত্রু দেখে তাঁর দিকে তেড়ে এলো হাঙরটা। উদ্যত ছোরা হাতে তিনি তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। যেই রাক্ষুসে মাছটা কাছে এগিয়ে এলো, অমনি চট ক'রে এক পাশে স'রে গিয়ে ছোরাটা তিনি আমূল তার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন।

কে যেন লাল রঙ ছিটিয়ে দিলে জলে। হাঙরটার একটা পাখনা আঁকড়ে তখনো বারে-বারে ছোরা চালাচ্ছেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁকেও এক ঝাপটায় ছিটকে পড়তে হ'লো—হাঙরটা হাঁ ক'রে তাঁর দিকে নেমে গেলো তৎক্ষণাৎ।

এই বুঝি সব শেষ হ'য়ে গেলো।

কিন্তু হঠাৎ কোত্থেকে একটা হারপুন এসে বিঁধলো সেই সিন্ধু-নেকড়ের হৃৎপিণ্ডে—ক্যাপ্টেন চট ক'রে একপাশে স'রে গেলেন!

নেড—নেড ল্যাণ্ডই তার হারপুন ছুঁড়ে ক্যাপ্টেন নেমোকে বাঁচিয়ে দিলে।

তৎক্ষণাৎ ক্যাপ্টেন নেমো সেই সিংহলী ডুবুরিকে নিয়ে জলের উপর ভেসে উঠলেন। ডিঙির উপরে উঠে অল্প চেষ্টাতেই তার জ্ঞান ফিরে এলো। হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেয়ে এতগুলো অদ্ভুত পোশাকপরা লোককে তার উপরে ঝুঁকে থাকতে দেখে লোকটা ভয়ে কেঁপে উঠলো। ক্যাপ্টেন নেমো তাকে একখানি মুক্তো উপহার দিলেন।

'নটিলাস'-এ ফিরে এসে নাবিকদের সাহায্যে ওই বিষম পোশাক খুলে ফেলে ক্যাপ্টেন নেমো প্রথম কথাটিই বললেন নেড-এর উদ্দেশে : 'ধন্যবাদ, নেড ল্যাণ্ড। তোমাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।'

'শোধবোধ হ'লো, ক্যাপ্টেন,' নেড ল্যাণ্ড বললে, 'প্রথম ধন্যবাদটা আমারই জানানো উচিত ছিলো।'

ক্যাপ্টেনের মুখে সূক্ষ্ম একটু হাসির রেখা খেলে গেলো।

পৃথিবী থেকে, মানবজাতির কাছ থেকে, নিজেকে যিনি অমনভাবে বিচ্ছিন্ন ক'রে এনেছেন, নিজের জীবন বিপন্ন ক'রেও তারই একজন প্রতিনিধিকে তিনি যে কেন বাঁচাতে গেলেন, তার কোনো উত্তর পাওয়া সত্যি কঠিন। ক্যাপ্টেন নেমো যা-ই বলুন না কেন, তিনি নিজের হৃদয়কে এখনো সম্পূর্ণ হত্যা করতে পারেন নি। বাইরে থেকে তাঁকে পাষাণ মনে হ'তে পারে, কিন্তু আসলে তিনি ঠিক তার উল্টো, এই কথাটি তাঁকে বলতেই ঈষৎ আবেগভরে তিনি বললেন, 'প্রফেসর, ওই ভারতীয়টি অতি শোষিত ও অত্যাচারিত দেশের অধিবাসী। আর আমিও, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত, তা-ই থাকবো।'

এ-কথার অর্থ কি এই যে তিনি একটি পরাধীন জাতির প্রতিনিধি? আর সেই জন্যেই ওই সিংহলীটির প্রতি তাঁর এত দরদ? না কি আক্ষরিকভাবেই তিনি ভারত নামক উপমহাদেশের অধিবাসী? রহস্যটা মোটেই পরিষ্কার হ'লো না বটে, কিন্তু এটা বোঝা গেলো এই বিদ্রোহী মানুষটি যে-কোনো পরাধীন জাতির জন্য আত্মবিসর্জন করতে পারে।

১৪

লাল সাগর ভূমধ্য

ফেব্রুআরি মাসের নয় তারিখে 'নটিলাস'-এর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন নেমোর দেয়া সেই চুরুট টানছি, আর দেখছি লোহিত সাগরের উপর দিয়ে 'নটিলাস' কেমন ক'রে আস্তে ভূমধ্য সাগরের দিকে ভেসে যাচ্ছে, এমন সময় ক্যাপ্টেন নেমো আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

'মঁসিয় আরোনা,' হঠাৎ হাসিমুখে তিনি জিগেস করলেন, 'জানেন, পরশু দিন আমরা ভূমধ্য সাগরে পৌঁছবো?'

'তাহ'লে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আসার জন্য "নটিলাস"কে

বাতাসের চেয়েও দ্রুত ছুটতে হবে।'

'উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরতে হবে কেন? আফ্রিকার পাশ দিয়েই যে যাবো, তা কে বললে?'

'"নটিলাস" যদি ডাঙার উপর দিয়ে না-যায়—'

'কেন? ডাঙার নিচে দিয়েও তো যেতে পারে।'

'নিচে দিয়ে?'

'লোকে এখন সুয়েজ খাল কাটছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি ঠাকরুন অনেক আগেই সে-কাজ সেরে রেখেছেন। সুয়েজের তলা দিয়ে পোর্ট সয়ীদ পর্যন্ত মাটির নিচ দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ গেছে, আমি তার নাম করেছি আব্রাহাম সুড়ঙ্গ।'

'সত্যি? সুড়ঙ্গটা কি দৈবাৎ আপনার চোখে প'ড়ে যায়?'

'অবশ্য একটু কাণ্ডজ্ঞানও খাটাতে হয়েছে। ওই সুড়ঙ্গ না-থাকলে আমি লোহিত সাগরে ঢুকতুম না।'

'সুড়ঙ্গটাকে কীভাবে আবিষ্কার করলেন, জানতে পারি? অবশ্য যদি আপনার কোনো আপত্তি না-থাকে?'

'ভাগ্য যাদের চিরকালের মতো এক সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, তাদের মধ্যে কোনো কথাই গোপন থাকা উচিত নয়।' ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, 'সুড়ঙ্গটার খোঁজ পেয়েছিলুম মাছ দেখে।'

'অর্থাৎ?'

'লক্ষ্য করেছিলুম যে একই জাতের কতগুলো মাছ ভূমধ্য সাগরে আর লোহিত সাগরে পাওয়া যায়—অথচ আমরা জানতুম এই দুই সমুদ্রের কোনো যোগসূত্রই নেই। তাহ'লে এরা এই দুই সমুদ্রে যাতায়াত করে কীভাবে? এ-রকম কোনো সুড়ঙ্গ থাকলে লোহিত সাগর থেকেই তা উত্তরমুখো যাবে, কারণ লোহিত সাগরের উচ্চতাই বেশি। আমার অনুমান ঠিক কিনা বোঝবার জন্য রাশি-রাশি মাছ ধ'রে ল্যাজে পিতলের আংটি বেঁধে আবার সমুদ্রে ছেড়ে দিলুম। কয়েক মাস পরে সিরিয়ার কাছে এই আংটি-বাঁধা মাছগুলোকেই খুঁজে পেলুম। তখন

আর আমার কোনো সন্দেহই রইলো না। ফলে "নটিলাস" জলের তলায় সরেজমিন তদন্তে বেরোলো, আর সহজেই সন্ধান পাওয়া গেলো। আপনিও শিগগিরই সুড়ঙ্গটা দেখতে পাবেন, আমি ছাড়া যার হদিশ আর-কেউ জানে না।'

পরের দিন সন্ধেবেলায় 'নটিলাস' সুয়েজের কাছে পৌঁছেই জলের তলায় ডুব দিলে।

সেই আরবা সুড়ঙ্গ দেখতে পাবার প্রত্যাশায় আমি চঞ্চল ও অধীর হ'য়ে উঠেছিলুম। বোধহয় আমার চাঞ্চল্য লক্ষ ক'রেই ক্যাপ্টেন নেমো জিগেস করলেন, 'প্রফেসর, আপনি কি আমার সঙ্গে চালকের ঘরে যেতে রাজী আছেন?'

'এই কথাটিই জিগেস করবো কিনা ভাবছিলুম, কিন্তু কিছুতেই আর সাহস পাচ্ছিলুম না।'

'তাহ'লে আসুন।'

ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে নিয়ে চালকের খাঁচায় গিয়ে হাজির হ'লেন। চৌকো একটি ঘর, লম্বায়-চওড়ায় ছ-ফুট—মিসিসিপি কিংবা হাডসন নদীর জাহাজের সারেঙের ঘরটা যেমন হয় তেমনি দেখতে। ঘরটার ঠিক মধ্যখানে রয়েছে চাকাটা, চারদিকের দেয়ালে চারটে কাঁচের জানলা, যাতে সারেঙের পক্ষে চারপাশ দেখা সম্ভব হয়।

সারেঙের কামরাটা অন্ধকার, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার চোখ আবছায়ায় অভ্যস্ত হ'য়ে গেলো। কামরার পিছনে যে-লণ্ঠনটা জ্বলছিলো তার আলো এসে পড়েছে জলে, আর ঝলমল ক'রে উঠেছে সিন্ধুতল।

'এবার সুড়ঙ্গের মুখটা খুঁজে বার করতে হবে,' ব'লে বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে ইঞ্জিন-ঘরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন ক্যাপ্টেন নেমো, যাতে একই সঙ্গে 'নটিলাস'-এর বেগ আর দিক নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। একটি ধাতুনির্মিত হাতলে চাপ দিয়ে চাকার গতিটা অনেক কমিয়ে ফেললেন তিনি।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে চোখের সামনেই আধো-আলো আধো-আবছায়ায়

মধ্যে সুয়েজের তীরের খাড়া পাথুরে দেয়াল দেখতে পেলুম। দিগ্‌দর্শিকায় সজাগ চোখ রেখে ক্যাপ্টেন নেমো একের পর এক নির্দেশ পাঠাতে লাগলেন ইঞ্জিন-ঘরে।

রাত সোয়া দশটার সময় ক্যাপ্টেন নেমো এসে নিজেই হাল ধরলেন। হঠাৎ দেয়াল স'রে গিয়ে সামনে গভীর-কালো এক বিকট গহ্বরকে হা ক'রে থাকতে দেখলুম, 'নটিলাস' সেই পাথুরে মুখের ভিতর নির্ভয়ে ঢুকে পড়লো। চারপাশ থেকে প্রবল জলকল্লোল উঠছে—ঢালু বেয়ে লোহিত সাগরের জল ছুটে চলেছে ভূমধ্য সাগরের দিকে, আর তারই জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে থরোথরো 'নটিলাস' দ্রুতবেগে এগিয়ে চললো।

টেরচাভাবে আলো পড়ে পাথরের দেয়ালে, মাঝে-মাঝে দেয়ালগুলো যেন দ্রুত এগিয়ে আসে 'নটিলাস'-এর দিকে, আর আমার বুকে যেন দুমদাম ক'রে হাতুড়ির বাড়ি পড়ে। শেষকালে এই পাথরের দেয়ালে প্রচণ্ড ঘা খেয়ে যদি 'নটিলাস'-এর সলিল সমাধি হয়!

দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় সারেঙের চাকা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন নেমো, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভূমধ্য সাগর।'

বিশ মিনিটও লাগলো না, প্রবল জলোচ্ছ্বাস 'নটিলাস'কে বহন ক'রে নিয়ে এলো ভূমধ্য সাগরে; সুয়েজ যোজক তার কাছে কোনো বাধা ব'লেই গণ্য হ'লো না।

১৫

সোনার সিন্দুক

ক্যাপ্টেন নেমো যে কেমন লোক, বোঝা শক্ত। এই বেশ হাসিখুশি, তারপরেই আবার গম্ভীর ও নিজের মধ্যে তন্ময়। যেমন চোদ্দোই ফেব্রুআরিতে তাঁকে দেখলুম তাঁর সেলুনে গভীর চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে আছেন। তাঁর সেই ব্যাকুল, গম্ভীর ও সমাহিত মূর্তি দেখে কোনো কথা

বলা সংগত বোধ করলুম না। 'নটিলাস' তখন গ্রীসের সমুদ্রে, ক্রীট দ্বীপের পাশে রয়েছে। আর সেই জন্তই হঠাৎ আমার মাথায় একটা প্রশ্ন ঘুরছিলো। আমি যখন 'আব্রাহাম লিঙ্কন'-এ আমেরিকা ত্যাগ ক'রে অতিকায় সিন্ধুদানবের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরোই, তখন ক্রীটের বাসিন্দারা তুর্কি শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলো। এই বিদ্রোহ কি আদৌ সফল হয়েছে, না কি তা সমূলে উৎপাটিত হয়েছে, তা আমি জানতুম না। সেদিন ক্যাপ্টেন নেমোকে দেখেই কেন যেন এই বিদ্রোহের ফলাফল জানবার জন্য কৌতূহলী বোধ করলুম। কিন্তু তাঁর ওই গম্ভীর মূর্তি দেখে কোনো প্রশ্ন জিগেস করার সাহস আর হ'লো না।

মানুষটিকে যত দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি, ততই আমার মূল ধ'রে টান দিচ্ছেন তিনি। গোপন সাধক ব'লে মাঝে-মাঝে মনে হয় তাঁকে—যেন লোকচক্ষুর আড়ালে কোনো-এক দুশ্চর তপশ্চর্যায় লিপ্ত। যুগপৎ সারল্য আর জটিলতার প্রতীক—যাবতীয় বিরোধের সমন্বয়েই যেন তাঁর আশ্চর্য অস্মিতা গ'ড়ে উঠেছে। আমার পরিচিত কোনো লোকের সঙ্গেই তাঁর কিছু মেলে না, কোনোকিছু না।

হঠাৎ উঠে গিয়ে একটি জানলা খুলে বাইরের চঞ্চল জলের দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন নেমো; আর ওই জলের পাশে তাঁকে দণ্ডায়মান দেখে আমার হঠাৎ মনে হ'লো একমাত্র সমুদ্রের সঙ্গেই বুঝি তাঁর তুলনা হ'তে পারে। সমুদ্রের মতোই অতলস্পর্শী তাঁর ব্যক্তিত্ব—তেমনি রহস্যময় ও জটিল; তেমনি চঞ্চল অধীর ও ক্ষিপ্র, তেমনি শান্ত সুনীল ও দিগন্তচুম্বী; সমুদ্রের মতোই যেন হিংস্র, সমুদ্রের মতোই যেন প্রবল, আবার সমুদ্রের মতোই স্নিগ্ধসুষমায় সমাকুল।

হঠাৎ পাশের জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি জলের মধ্যে একজন ডুবুরি নেমে এসেছে। প্রবল বেগে সাঁতার কাটছিলো লোকটি, আবার মাঝে-মাঝে নিশ্বেস নেবার জন্যে ভেসে উঠেছিলো জলের উপর। তারপরেই আবার ডুব দিয়ে নেমে আসছিলো জানলার কাছে।

ক্যাপ্টেন নেমো দাঁড়িয়ে ছিলেন অন্ত-একটি জানলার কাছে। আমার চীৎকার শুনে এই জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি। ডুবুরিটি আরো-কাছে এগিয়ে এলো। অবাক হ'য়ে লক্ষ করলুম, জানলার এ-পাশ থেকে হাত তুলে কী-একটা ইঙ্গিত করলেন ক্যাপ্টেন, উত্তরে লোকটা হাত নেড়ে উপরে উঠে গেলো—আর ফিরে এলো না। এবার আমার দিকে ফিরে তাকালেন ক্যাপ্টেন, বললেন, 'ভয় পাবেন না। ও হচ্ছে মাটাপান অন্তরীপের নিকোলাস—যদিও সবাই ওকে "পেস্কে" বা মাছ ব'লে ডাকে। আশপাশের সব কটা দ্বীপ ওর চেনা। অমন সাহসী ডুবুরি বোধহয় আর নেই।'

'আপনি ওকে চেনেন, ক্যাপ্টেন?'

'কেন চিনবো না, মঁসিয় আরোনা?'

এই কথা ব'লে ঘরের এক কোণায় গিয়ে একটা মস্ত সিন্দুকের ডালা খুললেন ক্যাপ্টেন নেমো। ডালার উপর তামার পাতে 'নটিলাস'-এর নাম লেখা, আর লেখা তার মূলমন্ত্র, 'চলার মধ্যে চলা'।*

সিন্দুকটার ভিতরে রাশি-রাশি সোনার ডেলা সাজানো। এত সোনা তিনি পেলেন কোত্থেকে? তা ছাড়া এখন এত সোনা দিয়ে কীই বা করবেন তিনি?

কোনো কথা না-ব'লে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখলুম একটা-একটা ক'রে সোনার ডেলা তুলে তিনি একটি বাক্সে বোঝাই করতে লাগলেন। যখন পুরো বাক্সটা বোঝাই হ'য়ে গেলো তখন শক্ত তালা লাগিয়ে বাক্সটার উপর আধুনিক গ্রীক হরফে কার যেন ঠিকানা লিখলেন তিনি। তারপর একটা হাতল ঘোরাতেই বাইরে ঘুন্টির আওয়াজ হ'লো, অমনি চারজন অনুচর এসে অতি কষ্টে বাক্সটাকে টেনে-টেনে সেলুনের বাইরে নিয়ে গেলো। তারপরে কপিকল দিয়ে বাক্সটাকে লোহার সিঁড়ি দিয়ে টেনে-তোলার শব্দও পেলুম।

এতক্ষণ পরে বোধহয় হঠাৎ আমাকে নেমোর মনে পড়লো। 'আপনি

* **Mobilis in Mobili.**

কিছু বলছিলেন, প্রফেসর?'

'কই, না তো।'

'তাহ'লে শুভরাত্রি রইলো।'

ক্যাপ্টেন নেমো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। আমিও অত্যন্ত কৌতূহলী হ'য়ে নিজের ঘরে ফিরে এলুম। ওই ডুবুরিটির ইঙ্গিত আর বাক্সভর্তি সোনার ডেলার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে কি না, ভাবতে লাগলুম আমি। অনেক রাত্রেও আমি যখন জেগে-জেগে এ-সম্বন্ধে নানা কথা ভাবছি, তখন নানা আন্দোলন ও আওয়াজ শুনে বুঝলুম 'নটিলাস' ধীরে-ধীরে জলের উপর ভেসে উঠলো। তারপরে প্ল্যাটফর্মে অনেক পায়ের শব্দ শোনা গেলো। আওয়াজ শুনে বুঝলুম নৌকো নামানো হ'লো সমুদ্রে।

ঘণ্টা দুয়েক পরে আবার প্ল্যাটফর্মে নৌকো টেনে-তোলার শব্দ শোনা গেলো। 'নটিলাস' আবার জলের তলায় ডুব দিলে।

সোনা তাহ'লে যথা-ঠিকানায় পৌঁছে গেলো? কোন সে ঠিকানা? কার কাছে এত সোনা পাঠালেন ক্যাপ্টেন নেমো?

হিংটিংছট প্রশ্নের মতো এই সব কথা ভাবতে-ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, জানি না। সকালে উঠে দেখি আমরা গ্রীসের উপকূল পিছনে ফেলে এসেছি।

যে-প্রবল বেগে 'নটিলাস' ভূমধ্য সাগর পেরিয়ে এলো, তাতে মনে হ'লো ক্যাপ্টেন নেমো কোনো কারণে বোধহয় এই অঞ্চলকে পছন্দ করেন না। হয়তো সমুদ্রের এই অঞ্চলে অনেক দুঃখের স্মৃতি জড়ানো আছে, তাই 'নটিলাস'-এর গতি তিনি মন্থর করতে চান নি। শুধু সিসিলির কাছে একটু সময় ডুবোপাহাড়ের প্রাচুর্যের জন্য মন্থর হয়েছিলো গতি, তারপর আবার জিবরাল্টার প্রণালীতেই প'ড়ে গতি অনেক বৃদ্ধি পেলো। যাবার সময় কেবল চকিতে একটুক্ষণের জন্য দেখা গেলো হারকিউলিসের সেই প্রাচীন মন্দির, এখন যা সিন্ধুতলের শ্যাওলায় সমাকীর্ণ। আর তারপরেই আমরা অতলান্তিক মহাসাগরে

এসে পৌঁছোলুম।

১৬

সিন্ধুতলের কোষাগার

'নটিলাস' আমাদের যত স্বাচ্ছন্দ্যই দিক, তবু বন্দী তো। ফলে নেড ল্যাণ্ড যখন পলায়নের পরিকল্পনা করলে, তখন আমাকে রাজী হ'তেই হ'লো।

মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টায় ভূমধ্য সাগর অতিক্রম ক'রে আমরা তখন অতলান্তিক মহাসাগরে এসে পড়েছি, ইস্পাহানের উপকূল ধ'রে আস্তে জলের তলা দিয়ে চলেছে 'নটিলাস'। ঠিক হয়েছে রাত নটার সময় 'নটিলাস'-এর নৌকোয় ক'রে আমরা পালাবো।

এই ক'দিন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা হয় নি। 'নটিলাস' ছেড়ে যাবার আগে শেষবার সব ভালো ক'রে দেখে যাবার ইচ্ছে হ'লো খুব। তাই রাত আটটার সময় আমি সন্তর্পণে ক্যাপ্টেন নেমোর ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। ভিতর থেকে কোনো শব্দ আসছে না দেখে সাহস সঞ্চয় ক'রে আস্তে একটু ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেলো।

তপস্বীর শাদাশিদে ঘরের মতো এই নিরাভরণ ঘরটিতে আমি আগেও গেছি। দেয়ালে নানা দেশের নেতাদের ছবি ঝুলছে; পোল্যাণ্ডের বীর নেতা কোসকিয়ুস্কো, আয়ারল্যাণ্ডের ডানিয়েল ও' কনেল, আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিঙ্কন আর জন ব্রাউন। এঁরা প্রত্যেকেই স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। ক্যাপ্টেন নেমোর রহস্যের সূত্র কি তবে এই ছবিগুলি? ইনিও কি দুর্ভাগা দেশের লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত মানুষদের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন? কোন সে আত্মীয়তার বাঁধন, যা বোটৎসারিস, ও' কনেল, ও আব্রাহাম লিঙ্কনের সঙ্গে তাঁকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে? আমেরিকার সাম্প্রতিক গৃহযুদ্ধের

কোনো নায়ক ইনি ? এই শতাব্দীর বৃহত্তম বিপ্লবের কোনো নেতা কি তিনি আসলে ?

হঠাৎ এমন সময়ে ঢং-ঢং ক'রে আটটা বাজলো ঘড়িতে। অমনি যেন আমি মূর্ছা থেকে জেগে উঠলুম। মনে পড়লো যে এ-ঘরে আসলে ঢুকেছিলুম দিগদর্শিকা দেখে আমাদের গতিপথ নির্ধারণ করতে। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে ধড়াচুড়ো প'রে তৈরি হ'য়ে নিলুম আমি, 'নটিলাস'-এরই দেয়া নাবিকের পোশাকে নিজেকে সজ্জিত ক'রে নিলুম।

পালাবার মুহূর্ত যত এগিয়ে আসতে লাগলো আমার বুকের স্পন্দনও তাই যেন বেড়ে চললো। সমস্ত 'নটিলাস'-এর কোনো সাড়া-শব্দ নেই, কেবল একটা ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসছে ; আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সঙ্গে যন্ত্রের এই গুঞ্জন যেন মিশে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে আমার উৎকর্ণ অস্তিত্ব প্রতীক্ষা করতে লাগলো চ্যাঁচামেচি ও হট্টগোলের ; এই বুঝি নেড ল্যাণ্ড পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা প'ড়ে যায় !

ন-টা বাজতে মাত্র কয়েক মিনিট বাকি, এমন সময় হঠাৎ যেন বুকের ভিতরটা ফাঁকা ক'রে দিয়ে ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন মিলিয়ে গেলো। ছোট্ট ধাক্কা দেখে বুঝলুম 'নটিলাস' আস্তে-আস্তে গভীর সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে। তাহ'লে কি আমাদের পলায়নের পরিকল্পনা আর গোপন নেই ?

এমন সময়ে ঘরের দরজা খুলে হাসিমুখে ভিতরে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন নেমো। 'এই-যে, প্রফেসর, আপনাকেই খুঁজছিলুম। ইস্পাহানের ইতিহাস আপনি জানেন তো ?'

এমন অবস্থায় কাউকে তার স্বদেশের ইতিহাসের কথাও জিগেস করলে সে কোনো উত্তর দিতে পারতো কিনা সন্দেহ।

আমাকে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নেমো আবার জিগেস করলেন, 'কী ? জানেন নাকি ?'

'যৎসামান্য,' কোনো রকমে এই কথাটিই বলতে পারলুম শুধু।

'ঠিক পণ্ডিতদের মতোই জবাব,' বললেন ক্যাপ্টেন, 'পণ্ডিত ব'লে তারা কিছুই জানে না—বসুন, আপনাকে ইস্পাহানের ইতিহাসের একটা কাহিনী শোনাই।'

ডিভানের উপর হেলান দিয়ে বসলেন ক্যাপ্টেন নেমো। তারপর গুনগুন ক'রে বলতে শুরু করলেন ইস্পাহানের জাতীয় সংগ্রামের দীর্ঘ কাহিনী।

সত্যি দীর্ঘ কাহিনী শুনিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন নেমো। ইংরেজ ওলন্দাজ আর আলেমান জাতিপুঞ্জের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য রাজা চতুর্দশ লুই-এর নেতৃত্বে ফ্রান্স ইস্পাহানের সঙ্গে মৈত্রী রচনা করলে। কিন্তু যুদ্ধের জন্য যে-বিপুল অর্থ চাই, তা কে জোগাবে! দক্ষিণ আমেরিকায় ইস্পাহানের তখন অঢেল ঐশ্বর্য। মায়া আর ইনকাদের সোনারুপোয় অনেক ইস্পাহানি জাহাজ বোঝাই করা হ'লো, আর তেইশটা ফরাশি যুদ্ধজাহাজ তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চললো ক্যাডিজের দিকে। খবর পেয়ে ইংরেজ নৌবাহিনা ক্যাডিজ অবরোধ ক'রে পথ আটকে ব'সে রইলো। ফলে বিপদ এড়াবার জন্য ফরাশি সেনাধ্যক্ষ আব ইস্পাহানি অধিনায়ক পরামর্শ ক'রে সোনাভর্তি জাহাজ নিয়ে চললেন ভিগো উপসাগরে, কিন্তু কোনো কারণে জাহাজ থেকে মাল খালাশ করতে বড্ড দেরি ক'রে ফেলেছিলেন তাঁরা—সেই সুযোগে ইংরেজ বাহিনী এসে তাদের আক্রমণ ক'রে বসলো। নীল জল লাল হ'য়ে গেলো সেই দারুণ যুদ্ধে, আর ফরাশি সেনাধ্যক্ষ যখন দেখলেন ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে কিছুতেই এঁটে-ওঠা যাবে না, তখন তাঁর আদেশে গোলাবারুদ দিয়ে সোনারুপোভরা ইস্পাহানি জাহাজগুলো জলে ডুবিয়ে দেয়া হ'লো। এই অতুল ঐশ্বর্য শত্রুর হাতে পড়ার চেয়ে সলিল-সমাধি হওয়া ঢের ভালো।

সাল-তারিখ-সংবলিত এই মস্ত গল্প শেষ হ'লো, কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না ক্যাপ্টেন নেমো হঠাৎ আমাকে এই কাহিনী শোনালেন কেন। 'তো কী?' আমি জিগেস করলুম।

'মঁসিয় আরোনা,' ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, "নটিলাস" এখন এই ভিগো উপসাগরেই নেমে পড়েছে।'

ক্যাপ্টেন নেমো উঠে দাঁড়িয়ে একটি জানলার পাশে নিয়ে গেলেন আমাকে। জানলা দিয়ে দেখলুম ডুবুরির পোশাক প'রে 'নটিলাস'-এর মাল্লারা বালি খুঁড়ে তোবড়ানো, ভাঙাচোরা, শ্যাওলা-পড়া বাক্স উদ্ধার করছে। অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে অজস্র জাহাজের ধ্বংসাবশেষ। সেই ভাঙা বাক্সগুলো থেকে রাশি-রাশি সোনারুপোর ডেলা, পুরোনো ইস্পাহানি মোহর ও মূল্যবান দীপ্ত পাথর ছড়িয়ে পড়লো সিন্ধুতলে, আর 'নটিলাস'-এর মাল্লারা তা দিয়ে বোঝাই করতে লাগলো মস্ত সব সিন্দুক। সিন্ধুতলের বালুরাশির উপর তারার মতো ঝিকিয়ে-ওঠা এই অকল্পনীয় ঐশ্বর্য দেখতে-দেখতে সব স্পষ্ট বুঝতে পারলুম আমি। শূন্য সিন্দুক আবার ভ'রে নেবার জন্যই ভিগো উপসাগরে এসেছে 'নটিলাস' —ইনকাদেব অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর এখন এই মানুষটিই।

হাসিমুখে আমাব দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন নেমো। 'এখন বুঝতে পারছেন তো কেমন ক'রে আমি ক্রোড়পতি হয়েছি?'

'বুঝলুম। কিন্তু এত ঐশ্বর্য, সব কিনা এমনিভাবে নষ্ট হচ্ছে—কোনো কাজেই লাগছে না?'

বলতে-বলতেই বুঝতে পারলুম অজান্তে আমি ক্যাপ্টেন নেমোকে আঘাত ক'রে বসেছি।

'নষ্ট হচ্ছে?' আহত বাঘেব মতো রুষ্ট স্বরে ব'লে উঠলেন নেমো, 'আপনি কি ভাবছেন এত কষ্ট ক'রে এই সম্পদ আমি উদ্ধার করছি নষ্ট করার জন্য, নিজের ভোগের জন্য? আমি যে এই ঐশ্বর্যের সদ্ব্যবহার করছি না, তা আপনাকে কে বললে? আপনি কি মনে করেন আমি খবরটুকুও রাখি না পৃথিবীর কোথায়, কোন-কোন দেশে, মানুষ নিপীড়িত লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হচ্ছে? এটা কি কিছুতেই বোঝেন না যে—'

হঠাৎ ক্যাপ্টেন নেমো থেমে গেলেন। বোধ হয় এত কথা তিনি বলতে চান নি। বোধ হয় এত উত্তেজিত না-হ'লে এ-সম্বন্ধে কোনো

কথাই তিনি বলতেন না। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলুম।

সমুদ্রের তলায় এই স্বাধীন নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নেবার পিছনে যে-কারণই থাক না কেন, ক্যাপ্টেন নেমো যে এখনো মানুষেরই সন্তান, এই তথ্য আমার অগোচর রইলো না। এখনো মানবজাতির দুঃখে ও লাঞ্ছনায় তাঁর বুক কাঁদে, এখনো অত্যাচারিত দীন জাতিদের উদ্দেশে তাঁর অঢেল ঐশ্বর্য ব্যয় হয়। আর অমনি আমি বুঝতে পারলুম বিপ্লব-জ্বলা ক্রীট দ্বীপের পাশ দিয়ে যাবার সময় কাদের উদ্দেশে তিনি ওই সোনাভরা সিন্দুক পাঠিয়েছিলেন।

১৭

লুপ্ত [illegible] গল্প

পরের দিন, উনিশে ফেব্রুআরি, সকালবেলায় নেড ল্যাণ্ড সবেগে আমার ঘরে এসে ঢুকলো। তারই প্রত্যাশা করছিলুম আমি। বড্ড হতাশ দেখালো তাকে।

'হ'লো তো!' হতাশভাবে সে বললে আমায়।

'তা কী করবে, বলো? ভাগ্য বিরূপ ছিলো কাল।'

'কিন্তু ঠিক ওই সময়টাতেই কিনা ক্যাপ্টেন জলের তলায় নামলো।'

'হ্যাঁ, নেড। ব্যাংকে গিয়ে টাকা তোলা দরকার ছিলো তাঁর।'

'ব্যাংকে?'

'ব্যাংক ছাড়া আর কী বলি? কোনো ব্যাংকের লোহার সিন্দুকের চেয়েও সমুদ্রের তলা অনেক বেশি নিরাপদ তাঁর কাছে—আর এখানেই তিনি তাঁর সব সম্পদ জমা রাখেন।' এই ব'লে কাল রাতের সব ঘটনা আমি তাকে খুলে বললুম। এত কথা তাকে বলার উদ্দেশ্য ছিলো এই যে যদি তাতে নেডের মতি ফেরে, যদি এর পর ক্যাপ্টেন নেমো সম্বন্ধে সে

আর বিরূপ না-হয়। কিন্তু সব শুনে নেড কেবল আপসোস ক'রে বলতে লাগলো যে—হায় রে!—সে কিনা ওই ইনকাদের সোনা আনতে যেতে পারলে না!

'ঠিক আছে। কোনো পরোয়া নেই,' যাবার আগে নেড বললে, 'পরের বারে ঠিক পালাবো, দেখবেন। দরকার হ'লে আজ রাতেই পালাবো—'

' "নাটিলাস" কোন দিকে যাচ্ছে, জানো?'

'না।'

'আচ্ছা, দুপুরবেলা ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে আমি জেনে নেবো।'

নেড কোনসাইলের খোঁজে চ'লে গেলো।

পালাবার পরিকল্পনা কিন্তু সেদিন তাকে বাদ দিতে হ'লো। প্রথমত আশপাশে কোথাও ডাঙার চিহ্ন দেখা গেলো না; উপরন্তু আকাশে মেঘের আনাগোনা দেখে ঝড়ের সম্ভাবনাটা আর অগোচর রইলো না। নেড রাগে এমন ভাব করতে লাগলো যে পারলে সে যেন মেঘেদের ছিঁড়ে খায়। আমি কিন্তু গোপনে বলি যে মেঘ দেখে আমার অতটা দুঃখ হয় নি—পালাবার জন্য আমি আর অতটা উৎসুক ছিলুম না।

ক্যাপ্টেন নেমোর সঙ্গে দেখা হ'লো রাত এগারোটায়। আমাকে দেখেই জিগেস করলেন আমি ক্লান্ত কিনা। আমি মাথা নাড়তেই সরাসরি কাজের কথা পাড়লেন নেমো। 'মঁসিয় আরোনা, আপনি তো কখনো রাত্রিবেলায় সমুদ্রের নিচে বেরোন নি। চলুন না, একটু ঘুরে আসা যাক। অবশ্য খুব ক্লান্ত লাগবে পরে, এ-কথা আগে থেকেই ব'লে রাখি। কারণ প্রথমত আমাদের অনেকটা পথ হাঁটতে হবে, উঠতে হবে এমনকি একটি পাহাড়ের চুড়োয়, দ্বিতীয়ত রাস্তাঘাট তেমন ভালো নয় —অনেকদিন মেরামত হয় নি কিনা।'

'আপনার কথা শুনে দ্বিগুণ কৌতূহল জাগছে। চলুন, যাই।'

ডুবুরি-পোশাক প'রে নিলুম দুজনে, সঙ্গে নিলুম লোহার আংটা-লাগানো লাঠি। কিন্তু দেখি বৈদ্যুতিক লণ্ঠন নেবার কোনো উদ্যোগই

করলেন না ক্যাপ্টেন নেমো। জিগেস করতেই বললেন, 'ও-লণ্ঠন আমাদের কোনো কাজেই লাগবে না।'

আমরা দুজনেই কেবল রাতের সিন্ধুতলে বেড়াতে বেরোবো—নেমো সঙ্গে কোনো অনুচর নিলেন না, বা নেড ও কোনসাইলকেও নেবার কোনো প্রস্তাব করলেন না। আমরা যখন সমুদ্রতলে পা দিলুম তখন রাত বারোটা বাজে। অনেক দূরে কোথায় যেন সমুদ্রের তলায় একটা লালচে আলো জ্বলছে, সেই দিকে আঙুল তুলে দেখালেন ক্যাপ্টেন প্রথমে, তারপর ওই লাল আলো লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে চললেন। আমিও তাঁর পাশাপাশি হাঁটতে লাগলুম।

ওই লোহার লাঠিটা কেন সঙ্গে নিতে হয়েছিলো, হাঁটতে গিয়ে তার কারণ বেশ স্পষ্টই বোঝা গেলো: সামুদ্রিক গুল্ম আর শৈবালে বারে-বারে পা পিছলে যাচ্ছিলো, হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে সামলে নিলুম প্রতিবারেই। এই পিছল উদ্ভিজ্জ সত্ত্বেও মনে হ'লো পায়ের তলার পাথুরে মাটির মধ্যে যেন কোনো সচেতন প্রকল্প রয়েছে, যেন নিসর্গসুন্দরীর স্বাভাবিক সৃষ্টি নয়, কারো পরিকল্পনা অনুসারেই রচিত ও বিস্তৃত। মধ্যে-মধ্যে মনে হ'লো আমার শিশের জুতোর তলায় রাশি-রাশি হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যাচ্ছে শব্দ ক'রে।

ক্রমশ পিছনে 'নটিলাস'-এর আলো যতই ক্ষীণ ও দূরবর্তী হ'য়ে এলো, সামনের সেই লাল দীপ্তিও যেন ততই উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে লাগলো। আরো খানিকটা এগোবার পর বুঝতে পারলুম ওই আরক্তিম আলোর উৎস হ'লো সামনের একটি পাহাড়ের চুড়ো। রাত যখন প্রায় একটা বাজে, তখন আমরা সেই পাহাড়ের পাদদেশে এসে দাঁড়ালুম।

এখানে সামুদ্রিক গাছপালা গজিয়েছে নিবিড় ও ঘন-ভাবে, আর সেই ঘন অরণ্যের মধ্যে দিয়েই পথ ক'রে নিয়ে এগোতে লাগলেন ক্যাপ্টেন নেমো। সবই যেন তাঁর অতি চেনা; একটুও ইতস্তত না-ক'রে কোনো রকম দোটানায় না প'ড়ে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন! দু-পাশে তাকিয়ে দেখলুম, সত্যি, পাইন গাছের জঙ্গল চ'লে গেছে সারিবদ্ধভাবে—

পাঁচে গেছে গাছগুলো, কোনো সবুজের চিহ্ন নেই, না পাতা, না অন্ত কিছু ; সোজা দাঁড়িয়ে আছে তারা, কয়লার খনির মধ্যে যেমনভাবে দূর অতীতের গাছের প্রতিভাস দেখা যায়—আর ডালপালার মধ্য দিয়ে রঙ-বেরঙের বিচিত্র মাছের দল সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে—যেন পাখি উড়ে যাচ্ছে পৃথিবীর বনে।

জঙ্গল যেখানে শেষ হ'লো পাহাড়ের চুড়ো সেখান থেকে বেশ-কিছু ফুট দূরে ; এবড়ো-খেবড়ো বন্ধুর পার্বত্যপথ ধ'রে আমরা উঠতে লাগলুম। কালো-কালো গর্তের মধ্যে, আনাচে-কানাচে, ঘুলঘুলির মতো পাহাড়ের ফাটলে কত সিন্ধুদানবের উজ্জ্বল চক্ষু দেখতে পেলুম, তাদের নড়াচড়ার শব্দ কানে এলো কতবার। পায়ের তলা থেকে কতবার স'রে গেলো বিকট দাঁড়-ওলা মস্ত কাঁকড়া আর অতিকায় চিংড়ি। নেমো দৃক্‌পাত না-ক'রে সোজা ওই চুড়োর দিকে এগিয়ে চললেন।

পাহাড়ের চুড়োয় পৌঁছে যে-আশ্চর্য দৃশ্য চোখের সামনে উন্মোচিত হ'লো তা আমার চিরকাল মনে থাকবে। সারা অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে অগুন্তি প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ—সবই কোনো পুরাকালীন মানুষের কীর্তি। শ্যাওলা-পড়া গুল্মেভরা প্রাসাদ আর মন্দিরগুলো চিনতে আমার সত্যি অনেকক্ষণ লাগলো। মানে কী এই ভগ্ন-স্তূপের ? এ কোন জনপদ এই সমুদ্রেগর্ভে বিলীন হ'য়ে গেছে ? এই বিশাল হর্ম্যরাজি কারা গড়েছিলো, কোন দেশের মানুষ ? কবে গড়েছিলো, কোন যুগে ?

বহু যুগের ওপার হ'তে যেন জলমর্মর ভেসে এলো। আমি যা ভাবছি সত্যি কি তবে তাই ? সাগ্রহে ক্যাপ্টেন নেমোর হাতটা চেপে ধরলুম আমি ; নেমো কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ না-ক'রে শুধু আরো এগিয়ে চললেন। কিছুক্ষণ পরে আরো-উঁচু একটা চুড়োয় ওঠবার পর সেই কোন দুরন্ত রক্তচক্ষুর মতো লাল আলোর উৎস চোখে পড়লো আমার : প্রায় পঞ্চাশ ফুট নিচেই পাহাড় হা ক'রে আগুন ওগরাচ্ছে—আগ্নেয়-গিরির জ্বালামুখি দিয়ে তপ্ত লাল লাভার স্রোত গলগল ক'রে বেরিয়ে আসছে। কোনো শিখা নেই—অক্সিজেন না-থাকলে শিখা থাকে না।

শুধু লাল গলগলে সেই তরল আগুন পাহাড়ের গা বেয়ে জলের মধ্যে গড়িয়ে পড়ছে।

মহাকালের এই প্রচণ্ড রক্তচক্ষু আর এই জনপদের ভগ্নস্তূপ একটা জাতির পুরো ইতিহাস ব'লে দিচ্ছে। দূরবিস্তৃত সমতল ভূমি জুড়ে এই পাহাড়ের তলায় একদা যে-সুন্দর নগর গ'ড়ে উঠেছিলো, সভ্যতার কোলাহল জেগেছিলো যেখানে একদা, এখন সেখানে ছাদ, মন্দিরের চুড়ো, মস্ত থামগুলির মধ্য দিয়ে লাভার স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে। দূরে একটা বন্দরের নিদর্শনও চোখে পড়লো। এখানে একদিন কত পাল-তোলা জাহাজ ফেনিল জলের উপর দিয়ে ভেসে যেতো।

আমার মাথার ভিতরটায় যেন আবর্ত খেলে গেলো। কোথায় আছি আমি, কোনখানে? আমার উন্মাদনা এতই প্রবল হয়েছিলো যে শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলে জিগেস করতে যাচ্ছিলুম আমি, কিন্তু ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে বাধা দিলেন। নিচু হ'য়ে খড়িমাটি তুলে তিনি সেই হারানো জগতের পাথরের গায়ে ছোট্ট একটি নাম লিখলেন: 'আটলান্টিস।'

যেন তড়িৎ খেলে গেলো আমার মধ্যে। চকিতে পরিষ্কার হ'য়ে গেলো এই লুপ্ত নগরীর রহস্য। যাকে এতকাল কিংবদন্তি ব'লে ভেবেছি, ওরিগেন ইয়ানব্লিখুস, ড্যানভিল, নাল্টে-ব্রুন, হুম্বোল্ট যার কথা বিশ্বাস করেন নি, প্লাতোর সেই আটলান্টিস নগরী, তেয়োপোম্পুসের সেই বিখ্যাত দেশ। শৌর্যে বীর্যে একদিন যারা উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিলো, প্রাচীন গ্রীকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেও যারা একদিন পেছ পা হয় নি, রাতারাতি এক প্রলয়ংকর ভূমিকম্পে তারা সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গেলো, সমস্ত কীর্তিধ্বজা সমেত নিঃশেষে হারিয়ে গেলো পৃথিবীর উপর থেকে।

আর আমি, সামান্য পিয়ের আরোনা, পারী বিচিত্রাভবনের কর্মচারী —আমি কি না এই লুপ্ত মহাদেশের বুকে দাঁড়িয়ে আছি এখন! যেন বহুযুগের ওপারের কোনো হারানো দেশের স্বপ্নে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলুম আমি। আর ক্যাপ্টেন নেমো সারাক্ষণ শ্যাওলাজমা একটি পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে পাথরের মতোই নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন। কী স্বপ্ন দেখেছেন

এই কবিমানুষটি এখানে? তিনি কি সেই হারানো মানুষদের কাছ থেকে জেনে নিতে চাচ্ছেন মানবভাগ্যের পরম রহস্য? যে-মানুষটি তার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে আধুনিক পৃথিবীকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সে কি বারে-বারে এখানে এসে অতীতের ছায়ার মধ্যে নিজেকে ফিরে পায়।

প্রায় একঘণ্টা ছিলাম সেখানে। সারাক্ষণ পায়ের তলায় মাটি কাঁপিয়ে সেই গনগনে রক্তিম তরল আগুন ব'য়ে গেলো এই হারানো মহাদেশের উপর দিয়ে। আর তারপর জলের উপর উঠে এলো কম্পমান পাণ্ডুর চাঁদ। চাঁদ ঠিক নয়, চাঁদের উজ্জ্বল প্রতিভাস শুধু। আর চাঁদের সেই ছায়ার মধ্যেই আমরা ফিরে চললুম।

যখন ক্লান্ত অবসন্ন দেহটিকে 'নটিলাস'-এ টেনে তুললুম, তখন আলো হ'য়ে এসেছে পুবদিক।

সূর্য উঠবে এবার।

১৮

লক্ষ্য : অবাচী

ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে ছুটে চলতে থাকে 'নটিলাস', লক্ষ্য তার অবাচী। আমরা পেরিয়ে এলুম সারাগাসো সাগর, পেরিয়ে এলুম তিমিঙ্গিলের দেশ, সিন্ধুতলের কয়লাখনি। ধীরে-ধীরে তুহিন অবাচীর দিকে এগোচ্ছি আমরা।

পঞ্চান্ন অক্ষরেখার কাছেই জলের উপর বরফের চাঙড় ভেসে থাকতে দেখেছিলুম, ষাট অক্ষরেখার কাছে এসে দেখি সামনে এগোবার পথ বন্ধ। হঠাৎ কে যেন আঙুল তুলে চঞ্চল সমুদ্রকে 'তিষ্ঠ' ব'লে থামিয়ে দিয়েছে এখানে, শুরু হয়ে গেছে ধূ-ধূ বরফের রাজ্য—শুভ্র, নিরেট, দিগন্ত-বিসারী।

ইচ্ছে করলেই 'নটিলাস'-এর মুখ ঘুরিয়ে নেয়া যেতো, কিন্তু ক্যাপ্টেন

নেমো কিছুতেই দ'মে যাবার মানুষ নন। খুঁজে-খুঁজে ঠিক একটা সংকীর্ণ পথ বার করলেন তিনি, তারপর তার ভিতর দিয়েই আশ্চর্য কৌশলে নিজে চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন 'নটিলাস'। চারপাশে প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই—শুধু ঠাণ্ডা হিম শাদা মরুভূমি ছড়িয়ে আছে দিগন্ত পর্যন্ত—স্তব্ধ নিশ্চল পরিবর্তনহীন এই শূন্যতার সঙ্গে কিছুরই বোধ হয় তুলনা হয় না। বৈদ্যুতিক চুল্লি জ্বালিয়ে 'নটিলাস'-এর ভিতরটা গরম রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল, পশু-লোমের মোটা পোশাক চাপিয়েছিলুম আমরা গায়ে, তবু তারই মধ্যে ঠাণ্ডা তার লোভী দাঁত বসাতে চাচ্ছিলো বারে-বারে।

মার্চ মাসের ষোলো তারিখে আমরা কুমেরু বলয় পেরিয়ে এলুম। নির্ভয় ক্যাপ্টেন নেমো তুহিন প্রাচীরের মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিয়ে এলেন 'নটিলাস', কোনোদিকে দৃক্‌পাত না-ক'রে পাৎলা বরফের স্তর ভেদ ক'রে এগিয়ে চললেন সামনে ; যে-পথ দিয়ে আমরা আসছি, সে-পথ দেখতে-দেখতে জ'মে বরফ হ'য়ে যাচ্ছে—এখন আর ইচ্ছে হ'লেও ফেরবার পথ রুদ্ধ। এগোবার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হ'লো আঠারোই মার্চ—কোনো ক্রমেই আর এগোনো সম্ভব হ'লো না 'নটিলাস'-এর পক্ষে। মস্ত সব তুহিন পাহাড় উঠেছে সামনে, আকাশ আড়াল ক'রে স্তব্ধ ও হিম তারা দাঁড়িয়ে আছে, তাপমাত্রা নেমে এসেছে শূন্য থেকে পাঁচ ডিগ্রি নিচে! চারপাশের বরফের মধ্যে আমরা বন্দী হলুম এতদিনে, যেন আস্ত গিলে ফেলেছে আমাদের বরফেরা। এতদিন হা ক'রে ছিলো বরফের দেশ, এইবার আস্তে-আস্তে আমাদের জঠরে পুরে ফেলছে।

এটা কিন্তু ক্যাপ্টেন নেমোর গোয়ার্তুমি। বেপরোয়াভাবে এই বরফের মধ্য দিয়ে না-এলেই হ'তো!

আমি বড্ড বিমর্ষ আর মলিন হ'য়ে পড়েছিলুম, তাই ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে জিগেস করলেন, 'এই যে মঁসিয় আরোনা, কী ভাবছেন অমন গম্ভীরভাবে?'

'ভাবছি সামনে যাওয়ার পথ তো বন্ধই, এবার ফিরে যাবার পথ

পেলেই হয়—তারও তো কোনো চিহ্ন দেখছি না।'

'"নটিলাস"কে অতটা অসহায় ভাববেন না, প্রফেসর,' বিদ্রূপের হাসি খেলে গেলো ক্যাপ্টেনের মুখে, 'আমার তো ইচ্ছে একেবারে কুমেরুতে গিয়ে থামি।'

'কুমেরুতে?' কিছুতেই আর অবিশ্বাস চেপে রাখতে পারলুম না আমি।

'হ্যাঁ, কুমেরুতে—পৃথিবীর দক্ষিণতম বিন্দুতে—যেখানে এখনো কোনো মানুষ পদার্পণ করে নি।'

'তাহ'লে কি দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করেছেন নাকি আপনি?'

'না, এখনো করি নি—তবে আমি আর আপনি, আমরা দুজনে মিলে করবো। বরফের বাধা কোনো বাধাই নয়। আমরা এই বরফের তলা দিয়েই চ'লে যাবো।'

'তলা দিয়ে?'

'নিশ্চয়ই। এটা তো জানেন যে বরফের একভাগ জলের উপর ভাসে, আর তিনভাগ থাকে জলের তলায়। সামনের ওই বরফের পাহাড়গুলো যদি তিনশো ফুট উঁচু হয়, তাহ'লে জলের তলায় রয়েছে নশো ফুট—তার তলা দিয়ে গেলেই তো হ'লো। আপনি তো এতদিনে এটা জেনেছেন যে "নটিলাস"-এর পক্ষে সমুদ্রের আরো-তলা দিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।'

'তা ঠিক।'

'অবশ্যি কোনো অসুবিধে যে নেই, তা বলি না। কতদিন জলের তলায় থাকতে হবে, তা জানি না। সঞ্চিত বাতাস ফুরিয়ে যাবার পরেও যদি কুমেরুবিন্দুতে ওঠবার পথ না-পাই, তাহ'লে শ্বাস রোধ হ'য়ে মরবো আমরা সবাই।'

তক্ষুনি নশো ফুট নিচে নামার আয়োজন শুরু হ'য়ে গেলো। নাবিকেরা কুড়ুল নিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে, চারপাশে বরফ কাটতে লাগলো তারা, আর চাড় দিয়ে-দিয়ে একটু-একটু পথ ক'রে নিচে নামতে

লাগলো 'নটিলাস'। নশো ফুট নামবার পরে জল পাওয়া গেলো, কিন্তু 'নটিলাস' নামতে লাগলো আরো নিচে—কারণ এর পরে কত ফুট উঁচু বরফের পাহাড় আছে, কে জানে। প্রায় আড়াই হাজার ফুট নিচে নেমে আসার পর আবার শুরু হ'লো এগিয়ে যাওয়া।

পরের দিন উনিশে মার্চ 'নটিলাস'-এর গতি ক'মে আসছে দেখে বোঝা গেলো জাহাজ এবার ধীরে-ধীরে উপরে ওঠবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ কিসের সঙ্গে যেন ভীষণ ধাক্কা লাগলো 'নটিলাস'-এর—অত বড়ো জাহাজটা থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো। বুঝলুম উপরে উঠতে গিয়ে বরফের গায়ে ঘা খেলো 'নটিলাস'। সর্বনাশ! দু-হাজার ফুট বরফ ভেদ ক'রে উপরে ওঠার ক্ষমতা তো 'নটিলাস'-এর নেই—তাহ'লে এই তুহিন জলেই তার সমাধি হবে! জাহাজ কিন্তু তবু নির্বিকারভাবে দক্ষিণ মুখো চললো, তারপর আবার আরেক ধাক্কা লাগলো বরফের সঙ্গে। এমনি ক'রে বারে-বারে ধাক্কা মারতে-মারতে এগোতে লাগলো 'নটিলাস', পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাইলো বরফের স্তর কোথায় পাৎলা হ'য়ে এসেছে, কোথায় সে খোলা সমুদ্রে ভেসে উঠতে পারবে! সারা রাত দুশ্চিন্তায় কেটে গেল আমার ; যদি বরফের স্তর পাৎলা না-হয়, তাহ'লে? কিন্তু সকালবেলাতেই ক্যাপ্টেন নেমো এসে সুখবরটা দিয়ে গেলেন আমাকে, 'খোলা সমুদ্রে এসে পড়েছি!'

প্ল্যাটফর্মে ছুটে এলুম। সত্যি, খোলা সমুদ্রই! যদিও ইতস্তত বরফের চাঙড় ছড়িয়ে আছে আশপাশে, তবু শান্ত নীল জলের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে 'নটিলাস'। আকাশে পাখির গান, জলে খেলা করছে মাছের ঝাঁক, 'নটিলাস'-এর চাকার শব্দ উঠছে ছলো-চ্ছলো। কে বলবে যে ওই বরফের প্রাচীরের আড়ালে এমন একটি স্পন্দমান সপ্রাণ জগৎ লুকিয়ে ছিলো!

আমার বুকের স্পন্দন বেড়ে গেলো। 'মেরুদেশে এসে পড়েছি তাহ'লে?'

'এখনো তা বলি না।' ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, সূর্য উঠলে দুপুর-

বেলা কম্পাস দেখে "নটিলাস"-এর অবস্থান স্থির করবো।'

ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'এই কুয়াশার মধ্যে সূর্যের দেখা পাবেন ব'লে ভাবছেন?'

'যতটুকু পাই তাই যথেষ্ট।'

মাইল দশেক দূরে ছোট্ট একটা দ্বীপ দেখতে পেলুম আমরা। 'নটিলাস'-এর নৌকোয় ক'রে ক্যাপ্টেন নেমো আমাদের দ্বীপে নিয়ে গেলেন। নৌকো তীরে ভিড়তেই কোনসাইল লাফিয়ে নামতে যাচ্ছিলো, কিন্তু আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ক্যাপ্টেন নেমো, আপনি আগে নামুন। এখানে সর্বপ্রথম পদার্পণ করার গৌরব আপনারই প্রাপ্য।'

ক্যাপ্টেনের পিছন-পিছন আমরাও নামলুম, কিন্তু দুপুর বারোটার সময়েও কুয়াশা ও ঘন বাষ্প ছিঁড়ে সূর্য দেখা দিলো না। তাই দ্বীপটার সঠিক অবস্থান না-জেনেই আমাদের ফিরে আসতে হ'লো।

পরের দিন বেলা নটার সময় যন্ত্রপাতি নিয়ে আবার আমরা ওই ছোট্ট দ্বীপে গিয়ে হাজির হলুম। বেলা বারোটার সময় কুয়াশার মধ্য দিয়ে আবছা দেখা গেলো সূর্যকে—ক্রনোমিটার এগিয়ে দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ঘোষণা করলুম, 'দুপুর বারোটা!'

'হ্যাঁ, দক্ষিণ মেরুই!' ব'লে দূরবিনটা আমার হাতে তুলে দিলেন ক্যাপ্টেন নেমো। দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেখি সূর্য ঠিক আধখানা ফালি হ'য়ে আছে।

একটা কালো নিশেন উড়িয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন নেমো। কালোর মধ্যে সোনালি হরফে তাঁর নামের আদ্যক্ষর লেখা; সূর্যের শেষ শিখা প'ড়ে সেই সোনার অক্ষরটি জ্বলজ্বল করতে লাগলো।

তারপর সূর্যের দিকে ফিরে তাকিয়ে শেষ রশ্মিটুকু লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'বিদায়, সবিতা, বিদায়! এবার তুমি বিশ্রাম নাও এই স্বাধীন সমুদ্রের তলায়, মিলিয়ে যাক তোমার নক্ষত্র-দ্যুতি। তারপর আমার নতুন দেশে নেমে আসুক ষাণ্মাসিক তমিস্রা!'

১৬

বন্দার তুষারবন্ধ

পরদিন, বাইশে মার্চ, সকাল ছটা থেকেই ফেরবার আয়োজন শুরু হ'লো। সন্ধ্যালোকের শেষ ঝলশানিটুকু যেন নিকষ কালো রাত্রির মধ্যে গ'লে যাচ্ছে। কনকনে ঠাণ্ডায় আমরা থেকে-থেকে কেঁপে উঠছি। আকাশে ক্রমশ তারাদের দীপ্তি বেড়ে যাচ্ছে, আর তারই মধ্যে ঝলমল করছে কুমেরুর সেই আশ্চর্য মেরুতারা।

জলাধারগুলি ভর্তি ক'রে জলের তলায় ডুব দিলে 'নটিলাস'। হাজার ফুট নিচে আস্তে, ঘণ্টায় পনেরো মাইল বেগে, ফিরে চললো উত্তর দিকে। সন্ধ্যাবেলাতেই সে হিমশৈলের তলা দিয়ে ফেরা শুরু করলো।

রাত যখন তিনটে, এক দারুণ ঝাঁকুনিতে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। উঠে বসতে-না-বসতেই আবার এক ঝাঁকুনির চোটে মেঝেয় ছিটকে পড়লুম আমি। কোনোরকমে দেয়াল ধ'রে-ধ'রে সেলুনে গিয়ে দেখি তখনো আলো জ্বলছে বটে, কিন্তু সারা ঘরে যেন প্রলয় হ'য়ে গেছে একটু আগে। দেয়ালের ছবিগুলো বেঁকে গেছে, ট্যারাবাঁকা হ'য়ে ঝুলছে তারা, আশবাবপত্র এলোমেলো ছিটকে পড়েছে। বোঝা গেলো 'নটিলাস' হঠাৎ কোনো-কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে কাৎ হ'য়ে প'ড়ে গেছে। বাইরে মস্ত শোরগোল শোনা গেলো, কিন্তু ক্যাপ্টেন নেমোর দেখা পাওয়া গেলো না। গভীরতা মাপবার যন্ত্রে দেখা গেলো তখনও এক হাজার ফুট নিচেই রয়েছি।

ক্যাপ্টেন নেমো এলেন একটু পরেই। চোখেমুখে দারুণ উদ্বেগের ছাপ। হাঠাৎ একটি হিমশৈল নাকি উল্টে যাওয়ার সময় 'নটিলাস'-এর উপর এসে পড়েছে। এখন অবশ্য আস্তে-আস্তে ভেসে উঠছে পাহাড়টা, সেই সঙ্গে 'নটিলাস'কেও তুলে ধরছে একটু-একটু ক'রে, আর সেই

জন্যেই 'নটিলাস' নাকি এখনো কাৎ হ'য়ে প'ড়ে আছে বরফের উপর। জলাধারগুলো খালি ক'রে ফেলে মাল্লারা প্রাণপণে চেষ্টা করছে 'নটিলাস'কে মুক্ত করতে, কিন্তু বিপদের আশঙ্কা তাতে একটুও কমছে না। 'নটিলাস'কে যে আস্তে-আস্তে তুলে ধরছে সেই হিমশৈল, তা গভীরতা মাপবার যন্ত্র দেখেই বোঝা গেলো, কারণ যন্ত্রে একটু-একটু ক'রে গভীরতা হ্রাস পাচ্ছে। এই তুলে-ধরা যদি বন্ধ করা না-যায় তাহ'লে জাঁতিকলের মধ্যে পড়বে 'নটিলাস'; জাঁতার মধ্যে গম যেমনভাবে থেঁৎলে যায় তেমনিভাবে উপরের আর নিচের বরফের মধ্যে থেঁৎলে চ্যাপ্টা হ'য়ে যাবে।

কিন্তু আপাতত এই আশঙ্কাকে নস্যাৎ ক'রে একটা মস্ত ঝাঁকুনি দিয়ে আবার ধীরে-ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো দেয়ালগুলো। দশ মিনিটের মধ্যেই আগের মতো আবার জলের মধ্যে ভাসতে লাগলো জাহাজ। কিন্তু জানলা দিয়ে যে-দৃশ্য চোখে পড়লো, তা আমাকে আতঙ্কে ভ'রে দিয়ে গেলো। উপরে-নীচে ডাইনে-বাঁয়ে চারপাশে বরফের অবরোধ, আর তারই মধ্যে এতটুকু সংকীর্ণ জলের মধ্যে ভাসছে 'নটিলাস'। হিমশুভ্র বরফের উপর তীব্র আলো এসে পড়েছে জাহাজ থেকে, আর প্রতিফলিত হ'য়ে তীব্র বিচ্ছুরণে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

আস্তে-আস্তে সামনে এগোতে থাকে 'নটিলাস'। কিন্তু তক্ষুনি যেন তীব্র আলোয় চোখ অন্ধ হ'য়ে গেলো। 'নটিলাস' চলছে ব'লেই সেই তীব্র শুভ্র প্রবল আলো যেন আরো বেশি ক'রে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে গেলো। জানলা বন্ধ ক'রে দিয়েও প্রথমটায় কিছুই দেখতে পাচ্ছিলুম না—যেন এই প্রবল বিচ্ছুরণ দৃষ্টিশক্তি হরণ ক'রে গেছে।

প্রাতঃকালে আবার ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি লাগলো; বুঝতে পারলুম, বরফের দেয়ালে ঘা খেয়েছে 'নটিলাস'। এবার 'নটিলাস' ধীরে-ধীরে পিছোতে লাগলো খোলা জলের পথ পাবার জন্য। কিন্তু সাড়ে-আটটার সময় যখন পিছনেও আবার প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো, তখন বুঝতে পারলুম দক্ষিণে যাবার পথও আর নেই।

আর সেই কথাই গম্ভীরভাবে ঘোষণা করলেন ক্যাপ্টেন নেমো। জানালেন, 'প্রফেসর আরোনা, আমরা আটকা পড়েছি। এবার তুষারমরুর সঙ্গে সরাসরি লড়াই ঘোষণা হ'লো।'

নেড আর কোনসাইল তখন সেখানে ব'সে ছিলো। ক্যাপ্টেন নেমোর কথা শেষ হবার আগেই নেড টেবিলের উপর এক প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দিলে। কোনসাইল টু শব্দটিও না-ক'রে বিবর্ণ মুখে ব'সে রইলো। আমি কোনো কথা না-ব'লে ক্যাপ্টেন নেমোর দিকে তাকিয়ে রইলুম। বুকের উপর আড়াআড়িভাবে দু-হাত ভাঁজ ক'রে গম্ভীরভাবে স্থির দাঁড়িয়ে আছেন তিনি—মুখবর্ণ পাণ্ডুর, শুধু চোখ দুটি অস্বাভাবিকভাবে জ্বলছে।

একটু পরেই ক্যাপ্টেন আমাদের এই বিপন্ন অবস্থার সব ভয়ংকর সম্ভাবনার কথা ব্যাখ্যা ক'রে বললেন। পরিস্থিতি যে-রকম দাঁড়িয়েছে, তাতে যদি চারপাশের বরফের বিস্তার 'নটিলাস'কে চূর্ণ নাও করে, বাতাসের অভাবে শ্বাসরোধ হ'য়ে মরতে হবে সবাইকে। কারণ বাতাসের ট্যাঙ্কে যতখানি হাওয়া ধরে, তাতে দু-দিন চলে 'নটিলাস'-এর। একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা জলের তলায় আছে 'নটিলাস', আর আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে বাতাসের ভাঁড়ারও ফুরিয়ে যাবে। ফলে মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টাই সময় আছে হাতে—তারই মধ্যে যেমন ক'রে হোক এই বরফের অবরোধের মধ্যে পথ কেটে বেরিয়ে পড়তে হবে 'নটিলাস'কে।

এর মধ্যেই 'নটিলাস'-এর বারোজন ডুবুরি একেকটা কুড়ুল হাতে বরফের মধ্যে নেমে পড়েছিলো। নেড ল্যাণ্ড আর ক্যাপ্টেন নেমোও গিয়ে কুড়ুল হাতে তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এখানকার বরফ প্রায় তিরিশ ফুট পুরু : 'নটিলাস' যাতে গ'লে যেতে পারে, সেই জন্য যত বড়ো গর্ত খুঁড়তে হবে তার জন্য ৭০০০ ঘন-গজ বরফ সরানো দরকার। ক্ষিপ্রহাতে বরফ কাটা শুরু হ'লো। একেকটা বরফের চাঙড় মূল স্তূপ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সঙ্গে-সঙ্গে ডিগবাজি খেয়ে ভেসে উঠতে লাগলো উপর দিকে, আর একটু-একটু ক'রে পথ হ'তে লাগলো।

ঘণ্টা দুয়েক পর নেড ল্যাণ্ড ও অন্যান্যরা ক্লান্ত হ'য়ে বিশ্রামের জন্য ফিরে এলো ; এবার যাদের হাতে বরফ কাটার ভার পড়লো, তাদের মধ্যে আমি আর কোনসাইলও রইলুম। দু-ঘণ্টা পরে বিশ্রামের জন্য 'নটিলাস'-এ ফিরে এসে শিরস্ত্রাণ খুলতেই স্পষ্ট বুঝতে পারলুম ইতি-মধ্যেই 'নটিলাস'-এর বাতাস আস্তে-আস্তে ভারি আর দূষিত হ'য়ে উঠছে।

কিন্তু এভাবে কাজ ক'রে কোনো ফল হবে ব'লে মনে হ'লো না। প্রথমত ৭০০০ ঘন-গজ বরফ সরাতে হ'লে অন্তত পাঁচদিন ধ'রে একটানা বরফ কাটতে হবে আমাদের। অথচ হাওয়া ফুরিয়ে যাবে দু'দিনেই। আর, দ্বিতীয়ত, বরফ খুঁড়েই বা কী লাভ ? কারণ এই নিদারুণ ঠাণ্ডায় কিছুক্ষণের মধ্যেই টলমলে জলও বরফ হ'য়ে জ'মে যাচ্ছে—যেখানটায় খুঁড়ছি, সেখানটায় পরক্ষণেই আবার বরফের রাশি নিরেট কঠিন ধবল অট্টহাসির মতো জ'মে যাচ্ছে—যেন কোনো তুহিনদন্তিল নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ কারো, যেন এই পাষাণ তুষারমরু আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে উদ্দেশ করেই ধবল হাস্যে ফেটে পড়ছে।

আর নিষ্ফল চেষ্টার মধ্যেই পরদিন উপস্থিত হ'লো বাতাসের অভাবে শ্বাসকষ্ট। সেই সঙ্গে আরো ভয়ংকর বিপদের পূর্বাভাস হিশেবে দেখা গেলো বরফেব ছাদ ও দু'পাশের দেয়াল রাতারাতি আরো পুরু হ'য়ে উঠেচে আর অনেকখানি এগিয়ে এসেছে 'নটিলাস'-এর দিকে। জাহাজের সামনে পিছনে বোধ হয় দশ ফুট ক'রেও জল নেই।

ক্যাপ্টেন নেমো আর-একটি সমাধান বের করলেন মাথা খাটিয়ে। 'নটিলাস'-এর বড়ো-বড়ো চুল্লিতে জল গরম ক'রে সেই টগবগে জল পিচকিরির মতো চারপাশের দেয়ালে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি পেলো তাপমাত্রা, অবস্থা ঈষৎ নিয়ন্ত্রণে এলো। রাত্রির মধ্যেই তাপমাত্রা উঠে এলো শূন্যাঙ্কের এক ডিগ্রি নিচে। শূন্যাঙ্কের দু-ডিগ্রি নিচে জল জ'মে বরফ হয় ব'লে আপাতত আর বরফের দেয়ালের চাপে পিষ্ট হ'য়ে মরার ভয় রইলো না। কিন্তু ভীষণ হ'য়ে উঠলো শ্বাসকষ্ট।

মাত্র চার ঘন-গজ বরফ খুঁড়লেই 'নটিলাস' পথ পাবে, সাতাশে মার্চ আমরা এই অবস্থায় পৌঁছোলুম। আরো দু-দিন দু-রাত একটানা পুরো খাটলে হয়তো এই চারগজ বরফের মধ্যে ছ্যাঁদা করা যাবে। কিন্তু আর যে মোটেই বাতাস নেই। বেলা তিনটের সময় আমার চেতনা যেন বিলুপ্ত হ'য়ে এলো। অন্যদের অবস্থাও কিছু কিছু ভালো নয়। তবু তারই মধ্যে পুরোদমে কাজ চললো। হাঁশফাঁশ ক'রে নিশ্বাস নিচ্ছি আমরা, ঘূর্ণিরোগাক্রান্তের মতো টলছি, প্রচণ্ড ব্যথায় মাথার ভিতরটা ছিঁড়ে পড়তে চাচ্ছে; তবু তারই মধ্যে অনেকটা কাজ এগিয়েছে আমাদের: আর মাত্র দু-গজ বরফ কাটতে হবে।

ছ'দিন হ'লো এইভাবে বন্দী হ'য়ে আছি। ক্যাপ্টেন নেমোরও নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু তিনি এমন অবিচল আছেন যে তাঁকে দেখে কিছুই বোঝবার জো নেই। যখন আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়, তখন নেমো মরিয়া হ'য়ে স্থির করলেন শেষ স্তরটুকু তিনি 'নটিলাস'কে পূর্ণবেগে চালিয়ে বরফের দেয়াল ভেঙে চুরমার ক'রে বেরিয়ে যাবেন। 'নটিলাস'-এর জলাধারে জল ভরা হ'লো, ক্রমশ ভারি হ'য়ে উঠলো 'নটিলাস'। তারপরেই প্রচণ্ড শব্দে, বিস্ফোরকের মতো, বরফের স্তর কাটিয়ে 'নটিলাস' নিচে ডুবে গেলো।

পূর্ণবেগে উত্তরদিকে ছুটে চললো 'নটিলাস'। কিন্তু আর কতক্ষণ এভাবে থাকবে? আরো একটা দিন? পুরো একটা দিন? ততক্ষণ আমরা বেঁচে থাকতে পারবো?

আমার আর হুঁশ ছিলো না, আচ্ছন্নের মতো প'ড়ে আছি 'নটিলাস'-এর সেলুনে, আর কোনসাইল ও নেড তাদের জীবন বিপন্ন ক'রে আমার নাকের কাছে ছোট্ট একটা অক্সিজেনের টিউবের শেষ বাতাসটুকু ধ'রে আছে।

মাত্র বিশ ফুট বরফের তলা দিয়ে যাচ্ছিলো তখন 'নটিলাস'। হঠাৎ জাহাজের পিছন দিকটা হেলে পড়লো, মাথা উপর দিক ক'রে মস্ত দুরমুশের মতো প্রচণ্ড বেগে 'নটিলাস' আছড়ে পড়লো বরফের ছাদে,

তারপর একটু পিছিয়ে আবার সেই আগের জায়গাতেই হাতুড়ির মতো ধাক্কা খেয়ে বরফ ভেঙে ছিটকে বেরিয়ে গেলো 'নটিলাস'। আর তক্ষুনি হু-হু ক'রে উনপঞ্চাশ পবনের বেগে ভিতরে ঢুকলো খোলা হাওয়া।

'নটিলাস'-এর বহির্দ্বার খুলে দেয়ায় খোলা হাওয়া এসে ঢুকছে বাঁধভাঙা বন্যার মতো।

২০

গরগনের নাগকুণ্ডলী

উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে আমাজন পর্যন্ত চঞ্চল 'নটিলাস' ছুটে এসেছে ; কিন্তু আমেরিকার উপকূলের কাছে যাচ্ছে না কখনোই ; হয়তো তীরের কাছে যাওয়া না উপকূলের জাহাজের মুখোমুখি পড়ার কোনো দৈব সুযোগ ক'রে দেয়াও ক্যাপ্টেন নেমোর অভিপ্রেত নয়।

বিশে এপ্রিল বাহামার কাছে দিয়ে সাতশো ফ্যাদম জলের মধ্য দিয়ে ছুটে যাচ্ছিলো 'নটিলাস', আর তার বৈদ্যুতিক আলোয় কালো জল আলো হ'য়ে উঠেছিলো।

নেড ল্যাণ্ড যখন আমাকে জানলায় ডেকে নিয়ে গেলো, তখন বেলা এগারোটা বাজে।

'দেখুন, কী ভীষণ জানোয়ার?'

ভীষণই বটে! যেন কিংবদন্তির পাতা থেকে উঠে এসেছে সমুদ্রের এই অষ্টবাহু ড্র্যাগন। অতিকায় একটা কালামারি সে, বোধ হয় বত্রিশ ফিট হবে দৈর্ঘ্যে। প্রচণ্ড বেগে সে ছুটে আসছিলো 'নটিলাস'-এর দিকে। রোষে জ্ব'লে উঠেছে তার সবুজ চোখ দুটি, মাথা থেকেই বেরিয়েছে তার আটটি কদাকার ও ভয়ানক পাশ, গরগনের নাগকুণ্ডলীর মতো মাথা থেকেই তা কিলবিল ক'রে জলে আছড়াচ্ছে। তার কঠিন চঞ্চুটা কেবলি খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে—আর ধারালো দাঁতে সাজানো

তার কঠিন জিভটি লকলক ক'রে বেরিয়ে আসছে। অন্তত পঁচিশ হাজার পাউণ্ড ওজন হবে এই সিন্ধুদানবের। ভীষণ রোষে মুহুর্মুহু বদলে যাচ্ছে তার গায়ের রঙ—এই ধূসর, আবার পরমুহূর্তেই লাগছে বাদামি।

'নটিলাস'-এর উপস্থিতিই যে তার এই প্রবল রোষের কারণ তা বুঝতে আমাদের দেরি হ'লো না। আট হাতে সে জড়িয়ে ধরতে চাচ্ছে 'নটিলাস'কে ; কাচের ওপাশে বিষম রোষে সে প্রচণ্ডভাবে আছড়াচ্ছে তার অষ্ট পাশ। আর ইস্পাতে-মোড়া জাহাজকে মোটেই আঁকড়ে ধরতে পারছে না ব'লে আরো ক্রুদ্ধ ও প্রচণ্ড হ'য়ে উঠেছে প্রতিমুহূর্তে।

দৈবই আমাকে এই ভীষণ দানবের সম্মুখীন ক'রে দিলে। এই সুযোগ কিছুতেই নষ্ট করা উচিত হবে না। ভয় জয় ক'রে তাই কাগজ পেন্সিলে তার একটা ছবি আঁকতে ব'সে গেলুম আমি। ততক্ষণে জানলার ওপাশে আরো কতগুলি সিন্ধুদানবের আবির্ভাব হয়েছে, যেন কোনো বিক্ষুব্ধ মিছিল ক'রে তারা জলের এই নূতন জন্তুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে এলো। লোহার চাকায় তাদের চঞ্চুর মুহুর্মুহু আঘাত শোনা গেলো। গুণে দেখি সংখ্যায় তারা সাত : সবাই ক্ষিপ্তের মতো 'নটিলাস'কে আক্রমণ করতে চাচ্ছে।

হঠাৎ থরথর ক'রে কেঁপে উঠেই 'নটিলাস' নিশ্চল হ'য়ে গেলো।

'কল খারাপ হ'য়ে গেলো নাকি ?' জিগেস করলুম আমি।

'বোধ হয় না,' নেড বললে, 'কারণ "নটিলাস" তো ভেসেই আছে।'

ভেসে আছে বটে, কিন্তু এগোচ্ছে না। চাকা ঘুরছে না আর। পরক্ষণেই ফার্স্ট-অফিসারকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন নেমো। অত্যন্ত গম্ভীর ও চিন্তাভারাতুর তাঁর মুখ। আমাদের দিকে দৃক্‌পাত না-ক'রেই সোজা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি— সেই অক্টোপাসগুলোর দিকে তাঁর সেই দুর্বোধ্য জটিল ভাষায় কতগুলো নির্দেশ দিলেন তিনি। তারপর জানলার উপর লোহার পর্দা ফেলে দেয়া হ'লো। ফার্স্ট-অফিসার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

মাঝখানে অনেকদিন ক্যাপ্টেন নেমোর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।

অত্যন্ত বিমর্ষ দেখালো তাঁকে, ঈষৎ শোকাকুল।

তখনও ভয়ংকর বিপদটা সম্বন্ধে সচেতন হই নি আমি।

'অনেকগুলো অক্টোপাস জড়ো হয়েছে দেখছি।'

'হ্যাঁ, প্রফেসর। আর এদের সঙ্গেই হাতাহাতি লড়তে হবে আমাদের।'

'হাতাহাতি?'

'হ্যাঁ, কারণ ওদের শুঁড়ে পেঁচিয়ে গিয়েই "নটিলাস"-এর চাকা বন্ধ হ'য়ে গেছে।'

'কিন্তু—'

'ওদের শরীর এত নরম যে আমার বৈদ্যুতিক গুলি কোনো কাজেই আসবে না— কারণ কোনো বাধা না-পেলে, ধাক্কা না-লাগলে, ওই গুলি ফাটে না। কাজেই কুড়ুল দিয়েই লড়াই করতে হবে আমাদের।'

'আর হারপুন?' নেড যুদ্ধের সম্ভাবনায় লাফিয়ে উঠলো। 'অবিশ্যি যদি আমার সাহায্য সম্বন্ধে আপনার কোনো আপত্তি না থাকে।'

'কোনোই আপত্তি নেই, মিস্টার ল্যাণ্ড।'

'নটিলাস' ততক্ষণে জলের উপর ভেসে উঠেছে। 'নটিলাস'-এর একটি মাল্লা বহির্দ্বার খুলে দিলে। সঙ্গে-সঙ্গে লোহার সিঁড়ি বেয়ে কিলবিল ক'রে নেমে এলো একটা মস্ত সাপের মতো শুঁড়— কিংবা তাকে বাহুও হয়তো বলা যায়। আর মাথার উপর আরো কতগুলো শুঁড় দুলতে লাগলো। কুড়ুলের এক ঘায়ে সেই ভয়ংকর বাহুটা দু-টুকরো ক'রে দিলেন ক্যাপ্টেন নেমো।

প্ল্যাটফর্মে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় ভীষণ কাণ্ড হ'লো। আচম্বিতে একটা শুঁড় নেমে এসে সিঁড়ির কাছের সেই মাল্লাটিকে পাকে-পাকে পেঁচিয়ে নিয়ে এক হ্যাঁচকা টানে বাইরে তুলে নিয়ে গেলো। চীৎকার ক'রে উদ্যত কুঠার হাতে ক্যাপ্টেন নেমো তার অনুসরণ করলেন। আমরাও পিছন-পিছন উঠে এলুম।

সেই ভীষণ দৃশ্য ভাবলে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়। শুঁড়ে পেঁচিয়ে

সেই হতভাগ্য লোকটাকে শূন্যে দোলাচ্ছে সেই ভয়ংকর অক্টোপাস আর সেই অবস্থাতেই আর্তকণ্ঠে সে চেঁচিয়ে উঠছে : 'বাঁচাও! বাঁচাও!' ফরাশি ভাষায় সেই আর্তনাদ শুনে আমি চমকে উঠলুম। 'নটিলাস'-এ এতদিন তাহ'লে আমি ছাড়া আরো-একজন ফরাশি ছিলো, আর আজ মৃত্যু তার উদ্দেশে থাবা বাড়িয়েছে!

আট বাহুর ভীষণ বাঁধনে লোকটা হারিয়ে গেলো। কে তাকে ওই মরণ-আলিঙ্গন থেকে বাঁচাবে?

ক্যাপ্টেন নেমো কুঠার তুলে লাফিয়ে পড়লেন অক্টোপাসটার উপর, আরেকটা বাহু ছিন্ন ক'রে দিলে তাঁর কুঠার। ফার্স্ট-অফিসারটি তখন অন্য অক্টোপাসগুলোর সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ ক'রে চলেছেন। তিনজনে— নেড, কোনসাইল আর আমি— পাগলের মতো কুঠার চালাচ্ছি তখন। সাতটা বাহু কেটে ফেলার পরও শেষ বাহুটায় লোকটাকে শূন্যে তুলে ধ'রে নাড়াচ্ছে সেই সিন্ধুদানব। কিন্তু যেই ক্যাপ্টেন নেমো তার দিকে ছুটে গেলেন, অমনি তার পেটের থলে থেকে ঘন কালো রঙের একরকম কালি উগরে দিলে সেই অক্টোপাস, আমাদের চোখ যেন অন্ধ হ'য়ে গেলো। যখন দৃষ্টি ফিরে পেলুম ততক্ষণে সেই কালামারি জলের তলায় পালিয়েছে, আর সেই হতভাগ্য মাল্লাটির কোনো চিহ্নই নেই আশপাশে।

রাগে ক্ষোভে জ্ঞানশূন্যের মতো বাকি কালামারিগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লুম আমরা। সেই সর্পকুণ্ডলীর মতো বাহুগুলো ছিটকে পড়তে লাগলো কুঠারের ঘায়ে, রক্তে আর কালো কালির স্রোতে প্ল্যাটফর্ম ভেসে গেলো। কিছুতেই যেন সেই ভীষণ শুঁড়ের অরণ্য ফুরোয় না— যেন ছিন্ন বাহুমূল থেকেই নতুন বাহু গজাচ্ছে বারে-বারে। নেড ল্যাণ্ড তার হারপুন আমূল বসিয়ে দিচ্ছে কালামারিগুলোর সবুজ চোখে। কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে একটা শুঁড় তাকেও পেঁচিয়ে ধরলো কঠোরভাবে, আতঙ্কে ও বিভীষিকায় আমার বুক যেন তখন ফেটে যাবে, কিন্তু ক্যাপ্টেন নেমোর কুঠার তড়িৎবেগে দু-টুকরো ক'রে ফেললো সেই

ভীষণ শুঁড়, আর মৃত্যুপাশ থেকে বেরিয়ে এসে নেড তার হারপুন আমূল বসিয়ে দিলে সেই কালামারির তিন হৃৎপিণ্ডে।

'শোধবোধ হ'লো,' ক্যাপ্টেন নেমো বললেন নেড ল্যাণ্ডকে।

নেড কোনো কথা না-ব'লে হারপুন চালাতে-চালাতেই একটু নুয়ে তাঁকে অভিবাদন করলে।

কেউ যদি জিগেস করে তোমার জীবনে ভীষণতম পনেরো মিনিট কবে এসেছিলো, তাহ'লে এই ভয়ংকর যুদ্ধের কথাই বলবো আমি। পনেরো মিনিটের মধ্যেই সব তছনছ হ'য়ে গেলো। অক্টোপাসগুলো বিধ্বস্ত হ'য়ে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়লো, আর ঢেউয়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলো তাদের ছিন্নদেহ। আর ক্যাপ্টেন নেমো রক্ত মেখে ঘেমে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন প্ল্যাটফর্মে, যে-সমুদ্র তাঁর একজন অনুচরকে গিলে খেলো তার দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে তাঁর চোখ বেয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়লো।

২১

'নটিলাস'-এর রোষ

ভিক্তর য়ুগো ছাড়া আর কারো লেখনীই বোধ করি বিশে এপ্রিলের এই ভীষণ যুদ্ধের বর্ণনা দিতে অক্ষম। অন্তত আমি যে যা ঘটেছিলো তার কিছুই ফুটিয়ে তুলতে পারি নি তা খুব ভালো ক'রেই জানি। আর ক্যাপ্টেন নেমোর বিষাদ, বিলাপ ও অস্থিরতা ফোটাবার ক্ষমতাও কবি ছাড়া আর-কারো নেই; আর সেই কবিকেও নিশ্চয়ই মহাকবি য়ুগোর মতোই নিপুণ হ'তে হবে।

ইতিমধ্যে আমেরিকার সিন্ধুসলিল ছাড়িয়ে এসেছে 'নটিলাস'; য়ুরোপের উপকূল ধ'রেই চলেছি এখন আমরা। 'নটিলাস' কখনো জলের উপর ভেসে ওঠে, কখনো ডুব দিয়ে যায় অনেক দূর অবধি। পয়লা জুন

'নটিলাস' যখন ভেসে চলেছে এমন সময় হঠাৎ যেন গুমগুম ক'রে মেঘ ডেকে উঠলো। স্বচ্ছ নীল আকাশে মেঘের লেশমাত্র নেই; অথচ তাহ'লে এ কীসের শব্দ?

নেড, কোনসাইল আর আমি তখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিলুম। হঠাৎ পুব দিকে তাকাতেই দেখি মস্ত একটা কলের জাহাজ পূর্ণবেগে আমাদের দিকে ধাবমান—কয়েক মাইল দূর থেকেও দেখা গেলো তার চিমনি দুটো দিয়ে ভলকে-ভলকে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে।

'কীসের শব্দ হ'লো, নেড?' আমি জিগেস করলুম।

'কামানের।'

'কীসের জাহাজ ওটা, জানো?'

'দূর থেকে দেখে তো যুদ্ধজাহাজ ব'লেই মনে হয়। বোধ হয় আমাদের ডুবিয়ে দিতে চায়। এই জঘন্য "নটিলাস"কে যদি ওরা জখম করতে পারে তো আমার কোনো ক্ষোভ নেই।'

'কোন দেশের জাহাজ, বুঝতে পেরেছো?'

ভুরু কুঁচকে একটু তাকিয়ে নেড বললে, 'কোনো নিশেন তো দেখতে পাচ্ছি না। কোন দেশের জাহাজ বলা মুশকিল।'

জাহাজটা ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে, বেশ দ্রুত তার গতি; কিন্তু তবু কোনো নিশানেরই হদিশ পাওয়া গেলো না। নেড ব'লে উঠলো, ' "নটিলাস"-এর এক মাইল দূর দিয়ে গেলেও আমি সাঁৎরে গিয়ে উঠবো জাহাজটায়। আপনাদেরও তা-ই করতে পরামর্শ দিই।'

আমি কোনো উত্তর দেবার আগেই জাহাজের গলুইয়ের কাছে খানিকটা শাদা ধোঁয়া জেগে উঠলো। পরক্ষণেই 'নটিলাস'-এর পাশে জলে কী-একটা যেন বিপুল শব্দে আছড়ে পড়লো—বিস্ফোরণের শব্দটা কানে এলো তার পরেই।

'কী সাংঘাতিক! তাহ'লে ওরা যে আমাদের দিকে কামান দাগছে!'

'ভালোই তো! তাহ'লে ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে—জাহাজডুবির পর ভেলায় ভাসছি ব'লে ভুল করেনি—এই মস্ত

ডিমিজিলকে দেখেই তারা কামান দাগছে!'

নেড ভুল বলে নি। সত্যি, এতদিনে সারা জগৎ নিশ্চয়ই এই ডুবো জাহাজের কথা জেনে গেছে। 'আব্রাহাম লিঙ্কন' থেকে নেড যে-হারপুন ছুঁড়েছিলো, তা যে 'নটিলাস'-এর ইস্পাতের খোল ভেদ করতে পারে নি, তা দেখেই নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট বুঝতে পেরেছিলেন কীসের পিছনে তিনি ছুটেছিলেন। পৃথিবীর সমস্ত দেশের যুদ্ধজাহাজ নিশ্চয়ই এতদিনে এই অদ্ভুত ডুবোজাহাজটার খোঁজে হন্যে হ'য়ে উঠেছে।

আমাদের চারপাশে তখন বৃষ্টির মতো কামানের গোলা এসে পড়ছে। এখনো বেশ দূরে আছে ব'লেই কোনো গোলাই 'নটিলাস'-এর গায়ে এসে পড়ছে না। কিন্তু আশ্চর্য! গোলার শব্দ শুনেও 'নটিলাস'-এর লোকজনেরা কোনো কৌতূহল প্রকাশ করছে না কেন? ক্যাপ্টেন নেমোই বা কী করছেন?

নেড চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই সুযোগে "নটিলাস" থেকে পালাতেই হবে আমাদের। আসুন, ওদের সংকেত করি। হয়তো ওরা বুঝতে পারবে যে আমরা নির্বিরোধী সৎ মানুষ।' ব'লে পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে নেড নাড়তে যাবে, এমন সময় কার কঠিন হাতের ধাক্কায় নেডের মতো পালোয়ানও ছিটকে পড়লো প্ল্যাটফর্মে!

'পাষণ্ড!' বাজের মতো ফেটে পড়লেন ক্যাপ্টেন নেমো। 'তুমি কি চাও যে "নটিলাস"-এর খড়্গ দিয়ে ওই জাহাজটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করার আগে তোমাকেই আমি গেঁথে ফেলি!' সেই কণ্ঠস্বর যত না ভীষণ, তার চেয়েও ভীষণ হয়েছে তাঁর দেহচ্ছবি। রক্তহীন শাদা তাঁর মুখ, চোখের তারা দুটি মশালের মতো উজ্জ্বল। নেডের কাঁধ ধ'রে ঝাঁকুনি দিয়ে গর্জন ক'রে উঠলেন তিনি। তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে ওই জাহাজকে উদ্দেশ ক'রে মেঘের মতো গ'র্জে উঠলেন ক্যাপ্টেন নেমো: 'তুমি তাহ'লে জানো আমি কে! তুমি তাহ'লে জানো "নটিলাস" কোন অভিশপ্ত জাতির জাহাজ! তোমাকে চিনতে আমার দেরি হয় নি, তোমার পতাকা না-দেখেও তোমাকে আমি চিনি। কিন্তু এই ছাখো

আমার নিশেন—তোমাকে আজ দেখাই।' ব'লেই দক্ষিণমেরুতে তিনি যে-নিশেন উড়িয়েছিলেন ঠিক তেমনি একটি কালো নিশেন উড়িয়ে দিলেন 'নটিলাস'-এর উপর।

বোধ হয় তাঁর কথার উত্তরেই 'নটিলাস'-এর হালের উপর দারুণ শব্দে একটা গোলা এসে পড়লো—প'ড়েই ছিটকে তাঁর পাশ দিয়ে সমুদ্রের জলে আছড়ে পড়লো। কাঁধ ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন নেমো। আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'নিচে যান আপনি, সঙ্গীদের নিয়ে নিচে চ'লে যান।'

'আপনি কি জাহাজটাকে আক্রমণ করবেন ক্যাপ্টেন?' আমি চেঁচিয়ে উঠলুম।

'আক্রমণ নয়—আমি ওকে ডুবিয়ে দেবো।'

'না, না, তা করবেন না—'

'করবোই।' ঠাণ্ডা হিম তাঁর গলা, 'এ-সম্বন্ধে আপনাকে কোনো মতামত দিতে হবে না। যা আপনার কোনোদিনই দেখার কথা নয়, নিয়তি আজ তারই মুখোমুখি করেছে আপনাকে। আক্রমণ ওরা করেছে—প্রত্যুত্তর হবে ভয়ংকর। নিচে চ'লে যান।'

'কোন দেশের জাহাজ ওটা? কোথাকার?'

'আপনি জানেন না? আরো ভালো—অন্তত জাহাজটা কোন দেশের, এই রহস্য আপনার কাছে অজ্ঞাত থেকে যাবে। নিচে যান।'

এই আদেশ মান্য না-ক'রে উপায় ছিলো না। ততক্ষণে 'নটিলাস'-এর আরো পনেরোটি মাল্লা এসে ক্যাপ্টেন নেমোকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে—সেই ধাবমান জাহাজটির দিকে সেই একই প্রতিহিংসার দৃষ্টি নিয়ে অপলকে তাকিয়ে আছে তারা, কোনো পরম ঘৃণায় আর রোষে তারা যেন অগ্নিশিখার মতো জ্বলছে প্রত্যেকে। নিচে নামতে-নামতে শুনলুম আরো-একটি গোলা এসে আছড়ে পড়লো 'নটিলাস'-এর উপর, আর সঙ্গে-সঙ্গে ক্যাপ্টেন নেমো রোষে গর্জন ক'রে উঠলেন: 'আরো হানো তোমার গোলা, আরো। যত পারো নষ্ট করো তোমার ব্যর্থ গোলা।

কিন্তু এটা জেনে রেখো, "নটিলাস"-এর খড়্গকে এড়াবার ক্ষমতা তোমার নেই।'

আর সহ্য হ'লো না, ছুটে চ'লে এলুম আমার ঘরে। 'নটিলাস'-এর গতি বৃদ্ধি পেলো, বোঝা গেলো 'নটিলাস' কামানের পাল্লা থেকে দূরে স'রে যাচ্ছে। ওই যুদ্ধজাহাজ হচ্ছে হ'য়ে ঘুরুক 'নটিলাস'-এর পিছনে, তারপর 'নটিলাস' এক সময় তার অমোঘ উত্তর দেবে—প্রচণ্ড সেই উত্তর চুরমার ক'রে ফেলবে ওই জাহাজ।

এই পরিণতি অনিবার্য। আমি জানি। ক্যাপ্টেন নেমো যেন আদিম দেবতাদের মতো গ'র্জে উঠেছেন এখন, কোনো বন্য দেবতা—চরম তাঁর রোষ যখন খড়্গের মতো নামে, তখন নিস্তার নেই। তাঁর চোখ অলাতচক্রের মতো জ্ব'লে উঠেছে, আর তাই দেখেই বুঝেছি আমি। প্রকৃতির আদি শক্তিগুলো যখন জেগে ওঠে, বাজ বরুণ আগুন যখন ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে, তখন কে তাদের ঠেকাবার সাধ্য রাখে।

এই উন্মাদ জাহাজ ছেড়ে পালাতেই হবে আমাকে। এতদিন নেডের প্রস্তাব আমাব সম্পূর্ণ মনঃপূত হয় নি, কিন্তু এখন আর কোনো সংশয় নেই।

আর সঙ্গে-সঙ্গে কানে এলো জলাধারে জল ঢোকার শব্দ। 'নটিলাস' জলে ডুব দিচ্ছে। আক্রমণটা তাহ'লে জলের তলা থেকেই হবে? রাতেব অন্ধকারে 'নটিলাস'-এর খড়্গ আক্ষরিকভাবে এফোঁড়-ওফোঁড় ক'রে দেবে ওই জাহাজকে! হঠাৎ অনুভব করলুম 'নটিলাস' যেন পাগল হ'য়ে উঠলো—প্রচণ্ড হ'য়ে উঠলো তার গতিবেগ, থরথর কেঁপে উঠলো সমস্ত জাহাজ। তারপর একটা ছোট্ট ঝাঁকুনি লাগলো শুধু—আর কিছু নয়।

উন্মাদের মতো সেলুনে গিয়ে ঢুকলুম। গিয়ে দেখি জানলার পাশে ক্যাপ্টেন নেমো দাঁড়িয়ে আছেন—একা, গম্ভীর, নিশ্চুপ, অদ্ভুত দুর্ভেদ্য, বিষণ্ণ। তাকিয়ে দেখছেন কেমন ক'রে অত বড়ো যুদ্ধ জাহাজটা ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রের জলে।

আস্তে ডুবছে জাহাজটা ; একটু-একটু ক'রে জল ঢুকছে তার পাটাতনে—তারপরেই মস্ত একটা বিস্ফোরণে গোটা পাটাতনটা চৌচির হ'য়ে উড়ে গেলো। তারপর জাহাজটা দ্রুত নেমে এলো সিন্ধুতলে। আর্ত মানুষ, সমরসজ্জা, মস্ত হাল, ঘূর্ণ্যমান চাকা—সব তলিয়ে গেলো অথৈ জলে, যেখানে সিন্ধুতলের বালি তাদের জন্য সমাধি রচনা ক'রে অপেক্ষা ক'রে আছে।

ক্যাপ্টেন নেমোর দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখি অকম্পিত তিনি লক্ষ করলেন সব কিছু। সব যখন শেষ হ'য়ে গেলো নিজের সেই সন্ন্যাসীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন তিনি। দেয়ালে সারি-সারি ঝুলছে চিরযুগের বীরপুরুষদের ছবি : আর তারই তলায় আরো-একটা ছবির তলায় দুই হাত প্রসারিত ক'রে আর্ত মানুষের মতো নতজানু হ'য়ে ব'সে পড়লেন ক্যাপ্টেন নেমো।

ছবির ফ্রেমের মধ্য থেকে এক তরুণী মহিলা আর দুটি ছেলেমেয়ে অপলকে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন দেখলো এই মস্ত মানুষটির দেহ কোন প্রবল কান্নার বেগে বারে-বারে দুলে উঠলো।

২২

পাগল হে নাবিক!

ঝপঝপ ক'রে বন্ধ হ'য়ে গেলো সবগুলি জানলা। 'নটিলাস'-এর ভিতরটা অন্ধকার আর থমথমে। পাগলের মতো এই ভয়ংকর পাতাল ছেড়ে ছুটে পালাচ্ছে 'নটিলাস'—কিন্তু বিবেকের হাত থেকে সে পালাবে কোথায়?

খ্যাপা জানোয়ারের মতো কখনো সে ভেসে ওঠে, কখনো সে ডুব দেয়, আর সারাক্ষণ প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলে। যেন অমোঘ বিবেকের দংশন এড়িয়ে পালাতে চাচ্ছে কোনো আর্ত, ব্যর্থ, ব্যাকুল মানুষ।

এক-এক ক'রে কুড়ি দিন কেটে গেলো একই ভাবে। দিন নেই, রাত্রি নেই, শুধু এক ভয়ংকর গতি সর্বক্ষণ। কারো দেখা মেলে না। আমরা তিন দৈবাহত যাত্রী শুকনো মুখে ব'সে থাকি। আর রাতের বেলায় শুনি পাগল অর্গ্যানের আর্ত কলরোল। সময় নেই, অসময় নেই, ঝমঝম ক'রে কেবল আর্ত হৃৎপিণ্ডের মতো কাঁদে ওই অর্গ্যান। যেন কোনো শনিতে-পাওয়া দিনরাত্রি হানা দিয়েছে এখানে।

আর নয়। পালাতেই হবে।

স্বপ্নের ঘোরে শুনি নি কথা কটি; ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে দেখি নেড আমার উপর ঝুঁকে প'ড়ে ফিশফিশ ক'রে বলছে, 'আর নয়। পালাতেই হবে। এবং আজ রাতেই।'

'কখন?' আস্তে শুধোলুম।

'রাত্রে। ওরা পাহারা সরিয়ে নিয়েছে। অথচ ডাঙা এখান থেকে কাছেই। কুয়াশার মধ্যে ঝাপশা দেখতে পেয়েছি আমি—কয়েক মাইল দূরে কালো তীরের রেখা—।'

'তা-ই হবে। আজ রাতেই পালাবো।'

'নটিলাস' তখন স্কাণ্ডিনেভিয়ার উপকূল ধ'রে যাচ্ছে। সারা দিন ধ'রে আমি শেষবার ঘুরে বেড়ালুম 'নটিলাস'-এর ঘরে-ঘরে। তার গ্রন্থাগার, সংগ্রহশালা, যন্ত্রগৃহ—সমস্ত এই দশ মাসের স্মৃতিতে ভ'রে আছে। আমার দিনলিপিতে প্রতিদিনের কথা লেখা আছে, কিন্তু তবু কেমন অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে সারা দিন কেটে গেলো।

রাত্রে খাবার সময় নেড চুপিচুপি জানিয়ে দিলে যে সাড়ে দশটায় চাঁদ উঠবে, তার আগেই অন্ধকার থাকতে-থাকতে পালাতে হবে আমাদের।

আর রাতের অন্ধকারেই আবার কোন অফুরন্ত কান্নার প্রস্রবণ খুলে গেলো—বেজে উঠলো বিষণ্ণ অর্গ্যান।

সর্বনাশ!

ক্যাপ্টেন নেমো সেলুনে আছেন এখন—অথচ ওখান দিয়েই যে

আমাকে যেতে হবে। ভয় করি আমি তাঁকে, তাঁর মুখোমুখি দাঁড়ালে আমি দুর্বল হ'য়ে যাবো—এই আর্ত মানুষটিকে ছেড়ে তাহ'লে আর আমার পালানো হবে না।

সেলুনের ভিতরে সন্তর্পণে তাকিয়ে দেখি মিশমিশে অন্ধকারে ভূতের মতো ব'সে আছেন তিনি অর্গ্যানে—ঝমঝম সেই আর্ত ক্রন্দনের মধ্যে যেন কোনো-এক তৃতীয় ভুবন হাৎড়ে বেড়াচ্ছেন তিনি। আস্তে সেলুন পেরিয়ে এলুম আমি, পা টিপে-টিপে, সন্তর্পণে।

লাইব্রেরির দরজা খুলে বেরিয়ে পড়বো, এমন সময় ক্যাপ্টেন নেমোর বুক চিরে এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। কে যেন আমাকে পেরেক ঠুকে আটকে দিলে সেখানে। দেখলুম উঠে দাঁড়ালেন তিনি আস্তে; নিঃশব্দে, বুকের উপর দুই হাত ভাঁজ ক'রে, প্রেতের মতো এগিয়ে এলেন তিনি। আর তাঁর আর্ত হৃদয় ছিঁড়ে এই কটি যন্ত্রণাহত কথা বেরিয়ে এলো: 'হা ভগবান! যথেষ্ট! যথেষ্ট! আর নয়!'

মরিয়া হ'য়ে লাইব্রেরির মধ্যে দিয়ে ছুটে গিয়ে কয়েক লাফে সিঁড়ি টপকে প্ল্যাটফর্মে উঠে গেলুম। সেখানে নৌকোর মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়তেই দেখলুম নেড আর কোনসাইলও আগে থেকে এসে ব'সে আছে সেখানে। আমার চেতনা তখন আচ্ছন্ন। সেই অনুতপ্ত কথা কটি এখনো যেন গুমরে উঠছে আমার দুই কানে।

'শিগগির! বেরিয়ে পড়ো, এক্ষুনি!' রুদ্ধশ্বাসে ব'লে উঠলুম আমি।

নেড হালে বসলো, আর কোনসাইল আংটা খুলে দিলে সন্তর্পণে। আর তক্ষুনি এক দারুণ কোলাহল উঠলো জাহাজে।

তবে কি ওরা জেনে ফেলেছে যে আমরা পালাচ্ছি! নেড তাড়াতাড়ি আমার হাতে একটা ছোরা গুঁজে দিলে। আর তখনই একটা প্রবল শোরগোল কানে এলো: 'মেলস্ট্রম! মেলস্ট্রম!'

কী সর্বনাশ! মেলস্ট্রম!

আতঙ্কে আমার সর্বাঙ্গ হিম হ'য়ে এলো। শেষকালে নরোয়ের উপকূলের সেই ভীষণ ঘূর্ণিপাকে এসে পড়লুম, যার হাত থেকে এমনকি

মস্ত জাহাজেরাও রেহাই পায় না সচরাচর। কিন্তু পরক্ষণেই বোঁ ক'রে ঘুরপাক খেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো নৌকোটা, আর লোহার ফ্রেমে দারুণভাবে ঘা খেয়ে আমি আর্তনাদ ক'রে জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে গেলুম!

২৩

পুনশ্চ

চেতনা ফিরে এলো নরোয়ের উপকূলের এক ধীবরের গৃহে। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি নেড আর কোনসাইল উদ্বিগ্নভাবে আমার দিকে ঝুঁকে আছে।

কী ক'রে যে সে-রাতে ওই ভীষণ ঘূর্ণিপাকের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি, তা আমরা কেউই জানি না।

লোফোডেন আইল্যাণ্ডের এই ধীবরের গৃহে ব'সে-ব'সে দু-মাস ধ'রে ফ্রান্সগামী জাহাজের প্রতীক্ষা করতে-করতে আমার এই দশমাস জোড়া অভিজ্ঞতার কাহিনী লিখে ফেললুম। এখানে একটা কথাও নেই যা অতিরঞ্জিত, কি বিকৃত, কি অলীক কল্পনা। বরং বোধ হয় ঊনকথনের দোষই হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু 'নটিলাস'-এর কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। বারে-বারে ওই অদ্ভুত ডুবোজাহাজটি হানা দেয় আমার মনের মধ্যে।

'নটিলাস'-এর কী হ'লো? মেলস্ট্রমের ওই ভীষণ মরণ-আলিঙ্গন থেকে সে কি বেরিয়ে যেতে পেরেছে? আর ক্যাপ্টেন নেমো? তিনি কি এখনো বেঁচে আছেন? এখনো তিনি কি তাঁর প্রচণ্ড ও আর্ত হৃদয় নিয়ে প্রতিহিংসার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? না কি আবর্তমান সিন্ধুজলের অবিরাম ঢেউ তাঁর অন্তঃকরণ থেকে ঘৃণা আর রোষ মুছে দিয়ে তাঁকে শুদ্ধ সুন্দর ও মহান ক'রে দিয়ে গেছে? কে তিনি, কোন দেশের মানুষ, কী তাঁর পুরো নাম—এ-সব তথ্য কি কোনো দিনই

জানতে পারবো আমি ?

জানি না।

আমি শুধু সেই আর্ত, প্রবল, শুদ্ধ মানুষটির জন্য প্রার্থনা করতে পারি। আমার বাড়ির সামনে দিয়ে বেলাভূমি দেখা যায়, যেখানে একের পর এক ঢেউ ভেঙে পড়ে বারে-বারে। তাদের সেই অবিরাম ও ছন্দোময় স্পন্দনের মধ্যেও হয়তো সেই একই প্রার্থনা বেজে-বেজে ওঠে।